Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমীন আক্তার শায়লা

রোলঃ 23090121740

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমীন আক্তার শায়লা

রোলঃ 23090121740

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সীরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজমীন আক্তার শায়লা, আইডিঃ 23090121740 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সীরাহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাজমীন আক্তার শায়লা

(স্বাক্ষর)

নাজমীন আক্তার শায়লা

আইডিঃ 23090121740

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা (Introduction) 5

অধ্যায় ১: আরবের ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা (আইয়ামে জাহেলিয়াত) 10

অধ্যায় ২: নবীজি (সা.)-এর জন্ম, বংশ পরিচয় ও শৈশবকাল 13

অধ্যায় ৩: কিশোর ও যৌবনকাল এবং নবুওয়াত পূর্ব জীবন 30

অধ্যায় ৪: নবুওয়াত লাভ, গোপন ও প্রকাশ্য দাওয়াত 44

অধ্যায় ৫: মক্কী জীবনের নির্যাতন, হিজরত ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ 49

অধ্যায় ৬: মি'রাজ, বায়'আত ও মদীনায় হিজরত 65

অধ্যায় ৭: মাদানী জীবন: ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রধান যুদ্ধসমূহ 70

অধ্যায় ৮: উম্মুল মুমিনীন (রা.) এবং নবীজি (সা.)-এর পারিবারিক জীবন 125

অধ্যায় ৯: বিদায় হজ্ব ও নবীজির ইন্তেকাল 129

অধ্যায় ১০: সীরাত থেকে শিক্ষা 140

রেফারেন্স : 145

ভূমিকা (Introduction)

১. সীরাহ কী? (What is Seerah?)

ভাষাগত অর্থ: 'সীরাহ' (السيرة) শব্দটি আরবি ধাতু 'সার' (سَارَ) থেকে এসেছে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো— পথ, রাস্তা, চলার পদ্ধতি, জীবনচরিত্র বা কোনো ব্যক্তির জীবনযাত্রার ইতিহাস।

পারিভাষিক অর্থ: ইসলামী পরিভাষায়, 'সীরাত' বা 'সীরাতে নববী' বলতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম, শৈশব, নবুওয়াত লাভ, দাওয়াতী জীবন, হিজরত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মদীনা রাষ্ট্র পরিচালনা, তাঁর অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ইন্তেকাল পর্যন্ত পুরো জীবনের বাস্তব ও ঐতিহাসিক বিবরণকে বোঝায়।

সীরাত শাস্ত্রের আদি গ্রন্থ ও ইবনে হিশামের পরিচয়: সীরাত চর্চার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হলো মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর 'কিতাবুল মাগাযী ওয়া সিয়ার'। পরবর্তীতে আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম (রহ.) এই গ্রন্থটিকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পরিমার্জন, সংক্ষেপন ও বিন্যাস করেন, যা মুসলিম উম্মাহর কাছে "সীরাত ইবনে হিশাম" নামে পরিচিতি লাভ করে। এটিই সীরাত সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন, মৌলিক ও বিশুদ্ধতম উৎস।

সীরাত ও হাদিস শাস্ত্রের মধ্যকার মূল পার্থক্য

ইসলামী জ্ঞানের পরিমণ্ডলে সীরাত (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী) এবং হাদিস সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ধারা। আপাতদৃষ্টিতে এদের মধ্যে কিছু মিল চোখে পড়লেও, উভয়ের তথ্য গ্রহণ ও যাচাইয়ের নিয়মাবলীতে রয়েছে বিশাল ব্যবধান।

১. যাচাই-বাছাই ও কঠোরতার ক্ষেত্রে পার্থক্য

হাদিস বিশারদগণ (মুহাদ্দিসীন) কোনো বর্ণনা বা হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম নীতি ও সতর্কতা অবলম্বন করেন। একটি হাদিসের সূত্র বা 'সনদ' কতটা শক্তিশালী, তা নিখুঁতভাবে যাচাই করা হয়।

এর বিপরীতে, সীরাত রচয়িতাগণ বর্ণনার সূত্র বা সনদের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেন।

২. বিধান বা 'হুকুম' আহকামের সম্পর্ক

হাদিসের ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের হালাল-হারাম, ইবাদতের নিয়ম এবং বিভিন্ন আইনি বিধান (হুকুম-আহকাম) তৈরি হয়। ভুল বা দুর্বল সূত্রের ওপর ভিত্তি করে যেন মানুষ কোনো ভুল ইবাদত না করে, সেজন্যই মুহাদ্দিসগণ হাদিসের শুদ্ধতার ব্যাপারে আপসহীন ছিলেন।
অন্যদিকে, সীরাতকে মূলত একটি ঐতিহাসিক দলিল বা ইতিহাস হিসেবে দেখা হয়। সীরাতের আলোচনা থেকে সরাসরি শরীয়তের কোনো ফরজ-ওয়াজিব বা আইনি হুকুম আহকাম আহরণ করা হয় না। যেহেতু এর ওপর কোনো আইনি বিধান নির্ভর করে না, তাই সীরাত লেখকদের নিকট নিয়মের কড়াকড়ি কিছুটা কম ছিল।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর বক্তব্য: > হাদিস শাস্ত্রের মহান ইমাম, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) নিজেই বলেছেন— "আমরা যখন ইতিহাস বা জীবনী নিয়ে আলোচনা করি, তখন কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করি।"

৩. বর্ণনা গ্রহণের ভিন্নতা

এই নিয়মতান্ত্রিক পার্থক্যের কারণেই সীরাতের বইগুলোতে এমন অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা বা বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা হয়তো কঠোর হাদিস শাস্ত্রের মাপকাঠিতে 'সহীহ' বা বিশুদ্ধ হিসেবে টিকবে না। প্রাচীনকাল থেকেই মুসলিম স্কলার ও উলামায়ে কেরাম সীরাত ও হাদিসের ক্ষেত্রে এই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে এসেছেন।

সীরাহ-র উৎসসমূহ

১. আল কুরআন:

সীরাহ-র প্রথম ও প্রধান উৎস হলো আল কুরআন। অনেকেই সীরাহ-র উৎস হিসেবে কুরআনকে উপেক্ষা করেন, যা মোটেও ঠিক নয়। পুরো কুরআনই নাজিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাহ-র বিভিন্ন পর্যায়ে। তাই কুরআন ও সীরাহ একে অপরের পরিপূরক।

২. হাদীস:

প্রতিটি হাদীসই মূলত সীরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একেকটি খণ্ডচিত্র। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমগ্র জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানা যায় হাদীস থেকে। তাই নিঃসন্দেহে হাদীস সীরাহ-র দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৩. সীরাহ গ্রন্থসমূহ:

নির্দিষ্টভাবে 'সীরাহ' হিসেবে লিখিত গ্রন্থসমূহ এর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সীরাহ-র উপর প্রথম গ্রন্থ লেখা শুরু হয় তাবিঈদের সময় থেকে।

৪. শামায়েল গ্রন্থসমূহ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, শারীরিক গঠন এবং দৈনন্দিন আচার-আচরণের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহকে 'শামায়েল' বলা হয়। এই বিষয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ইমাম তিরমিযী রচিত **'শামায়েলে তিরমিযী'**। এই গ্রন্থগুলোও সীরাহ-র অন্যতম প্রধান উৎস।

৫. দালাইল গ্রন্থসমূহ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিযা (অলৌকিক ঘটনা) সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোকে বলা হয় 'দালাইল'। এই বিষয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো ইমাম বায়হাকী রচিত ১২ খণ্ডের **'দালাইলুন নবুওয়াত'**।

৬. সাহাবাদের ইতিহাস:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহচর বা সাহাবীগণের জীবনীর মধ্য দিয়ে তাঁর নবুওয়াতী জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যুদ্ধ এবং ইসলামের প্রাথমিক প্রসারের ইতিহাস জানা যায়। তাই সাহাবাদের ইতিহাস সীরাহ-র একটি অন্যতম স্তম্ভ।

৭. মক্কা ও মদীনার ইতিহাস:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের দুটি প্রধান অধ্যায় কেটেছে মক্কা ও মদীনায়। এই দুই পবিত্র নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং তৎকালীন ইতিহাস সীরাহ-র ঘটনাপ্রবাহকে সঠিকভাবে বুঝতে দারুণভাবে সাহায্য করে।

২. সীরাহ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা (Significance of Studying Seerah)

কুরআন এবং হাদীসের আলোকে সীরাত অধ্যয়নের প্রধান ৫টি গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও ঈমানের পূর্ণতা নবীজি (সা.)-এর জীবন না জানলে তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আর রাসূলের ভালোবাসা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। হাদীসে এসেছে: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে প্রিয় হব।" (সহীহ বুখারী)
"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে প্রিয় হব।" (সহীহ বুখারী)

দ্বিতীয়ত: পবিত্র কুরআনের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন কুরআনের অনেক আয়াত নির্দিষ্ট ঘটনা বা প্রেক্ষাপটের (শানে নুযূল) ওপর ভিত্তি করে নাযিল হয়েছে। সীরাত অধ্যয়ন ছাড়া কুরআনের সেই প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব প্রয়োগ বোঝা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত: আদর্শ জীবনের বাস্তব রূপরেখা আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনকে আমাদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় মডেল বানিয়েছেন। এর চেয়ে বড় কোনো গাইডলাইন মানুষের জন্য হতে পারে না। আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব: ২১)
"নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব: ২১)

চতুর্থত: দ্বীনের দাওয়াত ও হিকমত শিক্ষা একজন দা'ঈ কীভাবে প্রতিকূল পরিবেশেও মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবেন, চরম অত্যাচার সহ্য করেও কীভাবে ধৈর্য ধরবেন এবং শত্রুর সাথে কেমন আচরণ করবেন—তার সর্বোত্তম রাজনৈতিক ও সামাজিক কৌশল সীরাহ থেকেই শেখা যায়।

পঞ্চম: আখলাক ও চরিত্রের সংশোধন নবীজি (সা.)-এর দয়া, ক্ষমা, সততা, এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের লেনদেন সীরাতের পাতায় বিস্তারিত সংরক্ষিত আছে, যা মানুষের ভেতরের অহংকার ও পাপাচার দূর করে চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

অধ্যায় ১: আরবের ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা (আইয়ামে জাহেলিয়াত)

১.১ আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও এর গুরুত্ব (Geographical Location of Arabia)

আরব উপদ্বীপ (Peninsula) এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ভৌগোলিক দিক থেকে এটি এমন এক অনন্য অবস্থানে রয়েছে, যাকে প্রাচীন বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। এর তিন দিকে জলভাগ (পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর) এবং উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি অবস্থিত।

কৌশলগত ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব: আর-রাহীকুল মাখতূম-এর বিশদ বিবরণ অনুযায়ী, আরবের এই ভৌগোলিক অবস্থানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এটি তৎকালীন দুটি পরাশক্তি— রোমান সাম্রাজ্য (Byzantine) এবং পারস্য সাম্রাজ্যের (Sasanian) মাঝখানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক মরুভূমির দুর্ভেদ্য প্রাচীরের কারণে কোনো বিদেশী শক্তি আরবকে পুরোপুরি নিজেদের অধীনে নিতে পারেনি। এর ফলে আরবরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিজস্ব সংস্কৃতিতে বড় হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া, ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিখ্যাত বাণিজ্য পথটি (Silk Road-এর অংশ) আরবের বুক চিরে চলে গিয়েছিল, যার ফলে কুরাইশসহ আরবের বিভিন্ন গোত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করত।

১.২ আইয়ামে জাহেলিয়াত ও এর সময়কাল (Definition and Period of Jahiliyyah)

'জাহেলিয়াত' (الجاهلية) শব্দটি আরবি 'জাহলুন' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ অজ্ঞতা, মূর্খতা, বর্বরতা বা অন্ধত্ব।

পারিভাষিক ও ঐতিহাসিক অর্থ: ইসলামী ইতিহাসে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বলতে কেবল অক্ষরজ্ঞানের অভাবকে বোঝায় না; বরং এটি ছিল আল্লাহর তাওহীদ থেকে

বিমুখতা, সঠিক নৈতিক আদর্শের অনুপস্থিতি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক সামাজিক অবক্ষয়ের নাম।

সময়কাল: সীরাত গবেষকদের মতে, হযরত ঈসা (আ.)-এর আসমানে তুলে নেওয়ার পর থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত (আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর শুরু) মধ্যবর্তী অন্ধকার সময়টুকুকে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়।

১.৩ জাহেলী আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা (Social and Moral Condition)

প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল চরম বৈপরীত্যে ভরা। একদিকে যেমন তাদের মধ্যে মেহমানদারী ও বীরত্বের মতো কিছু ভালো গুণ ছিল, অন্যদিকে নৈতিকতার দিক থেকে সমাজটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

নারীর করুণ অবস্থা: জাহেলী সমাজে নারীদের কোনো মানবিক অধিকার বা উত্তরাধিকার ছিল না। তাদের কেবল ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো। পুরুষরা যত খুশি বিয়ে করতে পারত এবং যখন-তখন বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারত।

কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া: আর-রাহীকুল মাখতূম-এ উল্লেখ আছে, আরবরা কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে চরম অপমান ও দারিদ্র্যের কারণ মনে করত। এই কুসংস্কারের বশে অনেক নিষ্ঠুর পিতা নিজের নিষ্পাপ কন্যাসন্তানকে জীবন্ত মাটিচাপা দিত।

দাস-দাসী প্রথা: সমাজে দাস-দাসীদের অবস্থা ছিল পশুর মতো। মালিকরা তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাত এবং তাদের কোনো সামাজিক বা আইনী নিরাপত্তা ছিল না।

নৈতিক অবক্ষয়: মদ্যপান, জুয়া (মাইসির), ব্যভিচার এবং লুণ্ঠন ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। কবিরা তাদের কবিতায় মদ্যপান ও নারীর রূপের প্রশংসা করাকে গৌরবের বিষয় মনে করত।

১.৪ জাহেলী আরবের ধর্মীয় অবস্থা (Religious Condition)

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.)-এর রেখে যাওয়া বিশুদ্ধ 'দ্বীনে হানিফ' বা তাওহীদের আদর্শ আরবরা সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল।

মূর্তিপূজার প্রচলন: সীরাত ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী, আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে 'হুবাল' নামক মূর্তি প্রথম মক্কায় নিয়ে আসে এবং কাবা ঘরের ভেতর স্থাপন করে। এরপর থেকে আরবে মূর্তিপূজার মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। নবীজি (সা.)-এর আগমনের প্রাক্কালে পবিত্র কাবা গৃহের ভেতরে ও চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিটি গোত্রের জন্য আলাদা আলাদা প্রধান উপাস্য দেবতা ছিল (যেমন: লাত, উজ্জা, মানাত, হুবাল)।

শিরক ও কুসংস্কার: আরবরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানলেও বিশ্বাস করত যে, এই মূর্তিগুলো আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। এছাড়া তারা ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তীরের (আযলাম) সাহায্য নিত এবং পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ লক্ষণ বিচার করত।

অন্যান্য ধর্ম: মূর্তিপূজার পাশাপাশি আরবের কিছু অঞ্চলে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের বিকৃত রূপের প্রচলন ছিল এবং কিছু লোক অগ্নিপূজা (মাজুসী) করত। তবে খুব অল্প কিছু মানুষ (যেমন: ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল, যায়েদ ইবনে আমর) মূর্তিপূজা বর্জন করে এক আল্লাহর ইবাদত করার চেষ্টা করতেন, যাদের 'হানিফ' বলা হতো।

১.৫ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Political and Economic Condition)

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপস্থিতি: পুরো আরব উপদ্বীপে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন বা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। সমাজ পরিচালিত হতো সম্পূর্ণ গোত্রীয় প্রথার (Tribal System) ওপর ভিত্তি করে। 'জোর যার মুল্লুক তার'—এই নীতিতে দেশ চলত।

গোত্রীয় দ্বন্দ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ: সামান্য কারণে এক গোত্র অন্য গোত্রের ওপর চড়াও হতো। সীরাত ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে যে, ঘোড়দৌড় বা উটের পানি খাওয়ানোর মতো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'বাসুসের যুদ্ধ' বা 'দাহিস ও গাবরার যুদ্ধ' বছরের পর বছর (কখনো ৪০ বছর) ধরে চলত এবং হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটত।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: মক্কার কুরাইশদের অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল বাণিজ্য। তারা শীতকালে ইয়েমেনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক কাফেলা পাঠাত (যার উল্লেখ সূরা কুরাইশে আছে)। তবে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অভিশাপ ছিল 'সূদ' (Riba) এবং লুঠতরাজ, যার মাধ্যমে ধনকুবেররা গরীবদের ওপর চরম শোষণ চালাত।

অধ্যায় ২: নবীজি (সা.)-এর জন্ম, বংশ পরিচয় ও শৈশবকাল

২.১ বংশ পরিচয়: আদনান থেকে কুরাইশ ও হাশেমী গোত্র (Lineage and Family)
হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশলতিকা আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রভাবশালী ধারার সাথে সম্পৃক্ত। সীরাত গবেষকগণ তাঁর বংশপরিচয়কে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন, যার প্রথম অংশটি একদম নিখুঁত ও সর্বসম্মত।

পিতার দিক থেকে বংশধারা: মুহাম্মাদ (সা.) ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, ইবনে হাশিম, ইবনে আব্দে মানাফ, ইবনে কুসাই, ইবনে কিলাব, ইবনে মুররাহ, ইবনে কা'ব, ইবনে লুয়াই, ইবনে গালিব, ইবনে ফিহর (যাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ), ইবনে মালিক, ইবনে নাযার, ইবনে কিনানাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে মুদরিকাহ, ইবনে ইলিয়াস, ইবনে মুযার, ইবনে নিযার, ইবনে মা'আদ, ইবনে আদনান।

আদনান পর্যন্ত সংযোগ: আদনান ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-এর সরাসরি বংশধর। 'সীরাত ইবনে হিশাম'-এর বর্ণনা অনুযায়ী, নবীজি (সা.)-এর বংশধারা আদনান পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিতর্কহীন এবং বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত।

হাশেমী গোত্রের মর্যাদা: কুরাইশ বংশের মধ্যে 'বনু হাশিম' বা হাশেমী গোত্র ছিল সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। কাবা ঘরের জিয়ারতকারীদের পানি পান করানো (সিকায়া) এবং তাদের খাদ্য ও আবাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব (রিফাদা) এই গোত্রের ওপর ন্যস্ত ছিল। নবীজি (সা.) নিজেই এর সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীমের সন্তানদের মধ্য থেকে ইসমাইলকে পছন্দ করেছেন... এবং কুরাইশদের মধ্য থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।" (সহীহ মুসলিম)

"আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীমের সন্তানদের মধ্য থেকে ইসমাইলকে পছন্দ করেছেন... এবং কুরাইশদের মধ্য থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।" (সহীহ মুসলিম)

২.২ পবিত্র জন্ম ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ (The Blessed Birth and Miraculous Events)

হাতী পালনকারীদের (আসহাবুল ফীল) ঘটনার ৫০ দিন পর, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ (কারো মতে ৯ই রবিউল আউয়াল), সোমবার প্রত্যূষে মা আমিনার কোল আলো করে নবীজি (সা.) পৃথিবীতে আগমন করেন (আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ৫৭১ সালের ২০ বা ২২শে এপ্রিল)।

পিতৃহীন জন্ম: নবীজি (সা.)-এর জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ এক ব্যবসায়িক সফর থেকে ফেরার পথে মদীনায় (তৎকালীন ইয়াছরিব) ইন্তেকাল করেন। ফলে তিনি এতিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মকালীন অলৌকিক নিদর্শন: নবীজি (সা.)-এর জন্মের সময় বেশ কিছু অলৌকিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, যা সীরাত ইবনে হিশামে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে:

১. মা আমিনা বর্ণনা করেন, নবীজি (সা.) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর শরীর থেকে এমন এক নূরের (আলো) প্রকাশ ঘটেছিল, যার মাধ্যমে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল।

২. পারস্যের (ইরান) হাজার বছর ধরে জ্বলতে থাকা অগ্নিপূজকদের প্রধান অগ্নিকুণ্ডটি হঠাৎ নিভে যায়।

৩. পারস্য রাজপ্রাসাদের (কিসরা) চৌদ্দটি চূড়া ভেঙে পড়ে এবং সাওয়াহ হ্রদের পানি শুকিয়ে যায়, যা মূলত পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের কুফর ও জুলুমের পতনের ইঙ্গিত বহন করছিল।

পোত্র জন্মের সুসংবাদ পেয়ে দাদা আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি নবজাতককে পবিত্র কাবা ঘরে নিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ' (যার অর্থ— প্রশংসিত), যা তৎকালীন আরবে একেবারেই অপ্রচলিত একটি নাম ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র নামসমূহ ও এর তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয় জানার প্রথম মাধ্যম হলো তাঁর বরকতময় নামসমূহ। জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **"আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ; আমি 'আল-মাহী'**

(মিটিয়ে দেওয়া ব্যক্তি), যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরকে মিটিয়ে দিয়েছেন; আমি 'আল-হাশির' (একত্রিতকারী), যাঁর পায়ের কাছে (অর্থাৎ তাঁর পরে) মানুষকে হাশরে পুনরুত্থিত করা হবে; এবং আমি 'আল-আকিব' (সর্বশেষ), যাঁর পরে আর কোনো নবী নেই।"

অন্য এক বর্ণনায় তাঁর আরও কয়েকটি নাম এসেছে, যেমন— **নাবিয়্যুর রাহমাহ, নাবিয়্যুত তাওবাহ, আল-মুকাফফা** এবং **নাবিয়্যুল মালাহিম**।

পবিত্র কুরআনে সরাসরি তাঁর দুটি নাম এসেছে:

১. **মুহাম্মাদ** (কুরআনে উল্লেখ হয়েছে ৪ বার)।

২. **আহমাদ** (ঈসা আ.-এর মুখে ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে কুরআনে এসেছে ১ বার)।

নিচে তাঁর পবিত্র নামগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অর্থ তুলে ধরা হলো:

১. মুহাম্মাদ (محمد):

এই নামের অর্থ হচ্ছে **'যার সর্বাধিক ও বারবার প্রশংসা করা হয়'** (গুণগত সংখ্যার দিক থেকে সর্বোচ্চ)। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত তাঁর প্রশংসা করে। আজানের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রতি মুহূর্তে এই নাম ধ্বনিত হচ্ছে। সৃষ্টির মাঝে তাঁর চেয়ে বেশি প্রশংসিত আর কেউ নেই।

২. আহমাদ (أحمد):

এর অর্থ হলো **'যিনি সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বোত্তম উপায়ে প্রশংসা করেন'** (প্রশংসার মানের দিক থেকে সর্বোচ্চ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যেভাবে প্রশংসা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর যেভাবে গুণকীর্তন করেছেন— তার কোনো তুলনা হয় না। প্রশংসার এমন অনবদ্য মান আর কারও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

৩. আল-মাহী (الماحي):

এর অর্থ **'অপসারণকারী'** বা **'যিনি মিটিয়ে দেন'**। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত ও দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী থেকে কুফর, শিরক ও অন্ধকারের রাজত্ব মিটিয়ে দিয়েছেন।

৪. আল-হাশির (الحاشر):

এর অর্থ **'একত্রিতকারী'**। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবর থেকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং সমস্ত মানবজাতি তাঁর পেছনে বা তাঁর পরে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

৫. আল-আকিব (العاقِب):

এর অর্থ **'সর্বশেষ আগমনকারী'**। নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় তিনি সবার শেষে এসেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে রিসালাতের সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪০)

৬. নাবিয়্যুর রাহমাহ (نبي الرحمة):

এর অর্থ **'দয়ার নবী'**। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত বা আশীর্বাদস্বরূপ পাঠিয়েছেন। কুরআনে এসেছে:

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০৭)

৭. নাবিয়্যুত তাওবাহ (نبي التوبة):

এর অর্থ **'ক্ষমা বা তাওবার নবী'**। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে মানুষ আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ইসলামের আলোয় ফিরে আসে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করে।

৮. আল-মুকাফফা (المقفي):

এর অর্থ **'যিনি পূর্ণতা দান করেন'** বা **'যিনি পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেন'**। পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলদের শিক্ষা ও দ্বীনকে তাঁর মাধ্যমে চূড়ান্ত পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে।

৯. নাবিয়্যুল মালাহিম (نبي المَلَاحِم):

এর অর্থ **'মহাযুদ্ধ বা ফিতনার সময়ের নবী'**। তাঁর আগমনই কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত। কিয়ামতের আগে পৃথিবীতে দাজ্জালের ফিতনাসহ যে বড় বড় ফিতনা ও বিপর্যয় আসবে, সে সম্পর্কে তিনি উম্মতকে সতর্ক করেছেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুনিয়াত বা উপনাম

আরবীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুটি বিশেষ উপনাম বা কুনিয়াত ছিল:

- **আবুল কাসিম:** এটি তাঁর সবচেয়ে পরিচিত উপনাম। তাঁর বড় ছেলে কাসিমের নামানুসারে এই কুনিয়াত রাখা হয়েছিল।

- **আবু ইব্রাহীম:** তাঁর অপর পুত্র ইব্রাহীমের নামানুসারে এই উপনামটি রাখা হয়। ইব্রাহীম ছিলেন তাঁর কিতবতী দাসী মারিয়া কিবতিয়ার (রা.) গর্ভজাত সন্তান।

২.৩ বনু সা'দ গোত্রে লালন-পালন ও বক্ষ বিদারণ (Childhood in Banu Sa'd and Sacrosanct Cleansing)

তৎকালীন মক্কার কুরাইশদের প্রথা ছিল যে, তারা শহরের দূষিত পরিবেশ থেকে দূরে উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ মরুভূমির আবহাওয়ায় শিশুদের লালন-পালনের জন্য বেদুইন ধাত্রীদের কাছে পাঠাত। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি: শিশুদের শারীরিক গঠন মজবুত করা এবং তাদের খাঁটি আরবি ভাষা (ফাসাহাত) শেখানো।
হালিমা আস-সা'দীয়ার ঘরে আগমন: বনু সা'দ গোত্রের ধাত্রী হযরত হালিমা প্রথমে এতিম শিশু ভেবে মুহাম্মাদ (সা.)-কে নিতে চাননি। কিন্তু পরবর্তীতে অন্য কোনো শিশু না পেয়ে বরকত হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেন। নবীজি (সা.)-কে ঘরে আনার পর থেকেই হালিমা এবং তাঁর পরিবারের চরম দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়। তাঁদের বকরির ওলন্দ দুধে ভরে যায় এবং উটের স্তনে দুধ উপচে পড়ে। মরুভূমির শুকনো ঘাস সতেজ হয়ে ওঠে। এই বরকত দেখে হালিমা নবীজিকে দুই বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও আরও দুই বছর নিজের কাছে রেখে দেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনের এক অলৌকিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো 'বক্ষ বিদারণ' বা 'শকুস সদর' (বুক চিরে অন্তর পবিত্র করা)।

১ম বক্ষ বিদারণের ঘটনা

শৈশবে দুধমাতা হালিমার ঘরে থাকার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স যখন চার বা পাঁচ বছর, তখন প্রথমবার তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়। এই অলৌকিক ঘটনাটি হাদিসের অন্যতম বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহ মুসলিম-এ হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ:

একদিন শিশু মুহাম্মদ (সা.) অন্য শিশুদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে আসেন। তিনি আল্লাহর রাসূলকে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুক মোবারক বিদীর্ণ করেন এবং হৃদপিণ্ডটি বের করে আনেন। এরপর হৃদপিণ্ড থেকে রক্তের একটি চাকা (অংশ) বের করে জিবরাঈল (আ.) বলেন, "এটি আপনার ভেতরের শয়তানের অংশ (যা থেকে সাধারণ মানুষকে শয়তান প্ররোচিত করে)।"

তারপর একটি সোনার তশতরিতে রেখে জমজমের পানি দিয়ে তাঁর হৃদপিণ্ডটি ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে বুক জোড়া দিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে অন্য শিশুরা এই দৃশ্য দেখে ভয়ে দৌড়ে মাতা হালিমার কাছে গিয়ে খবর দেয় যে, মুহাম্মদকে মেরে ফেলা হয়েছে! পরিবারের লোকজন যখন আতঙ্কে ছুটে আসে, তখন তারা দেখতে পায় শিশু মুহাম্মদ (সা.) বিবর্ণ মুখে বসে আছেন। হযরত আনাস (রা.) পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন যে, তিনি নিজ চোখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বুকে সেই সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছেন।

অন্যান্য বক্ষ বিদারণের ঘটনাগুলো

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বা আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আরও কয়েকবার বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল বলে বর্ণনা পাওয়া যায়:

২য় বক্ষ বিদারণ: তাঁর বয়স যখন ১০ বছর, তখন দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর বুক মোবারক বিদীর্ণ করা হয়।
৩য় বক্ষ বিদারণ: নবুয়ত লাভের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে (যখন তিনি ওহী লাভ করবেন) তাঁর আত্মাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তৃতীয়বার এই ঘটনা ঘটে।
৪র্থ বক্ষ বিদারণ: বিখ্যাত মেরাজের রাতে, বায়তুল্লাহ (কাবা শরীফ) থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চতুর্থবারের মতো তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়।
মুহাদ্দিসগণের মতামত

বর্ণনাগুলোর মধ্যে ১ম ও ৪র্থ বক্ষ বিদারণের ঘটনাই সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বহুল পরিচিত। তবে আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (রহ.)-সহ অনেক ইসলামি স্কলারের মতে, চারবার বক্ষ বিদারণের প্রতিটি বর্ণনাই সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য। কোনো কোনো বর্ণনায় ৫ম বার বক্ষ বিদারণের কথাও উল্লেখ আছে, তবে সেটি হাদিস বিশারদদের (মুহাদ্দিসীন) সর্বসম্মত মতামত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

২.৪ মাতা ও দাদার ইন্তেকাল এবং আবু তালিবের তত্ত্বাবধান (Bereavement and Abu Talib's Guardianship)

মরুভূমি থেকে ফেরার পর নবীজি (সা.) মায়ের স্নেহে বড় হতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের ছায়া তাঁর জীবন থেকে সরেনি।

মাতার ইন্তেকাল: নবীজি (সা.)-এর বয়স যখন ৬ বছর, তখন মা আমিনা তাঁকে নিয়ে স্বামীর কবর জিয়ারত এবং আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে মদীনায় যান। মক্কার পথে ফেরার সময় 'আবওয়া' নামক স্থানে মা আমিনা তীব্র অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। বিশ্বনবী এবার সম্পূর্ণ মাতৃহীন এতিম হয়ে পড়েন। পরিচারিকা উম্মে আয়মান শিশু মুহাম্মাদকে মক্কায় দাদার কাছে নিয়ে আসেন।

দাদার স্নেহ ও ইন্তেকাল: মাতা হারানো পোত্রকে দাদা আব্দুল মুত্তালিব নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। কাবার ছায়ায় শুধু তাঁর জন্য পাতা গদিতে আর কাউকে বসতে দেওয়া হতো না, কিন্তু শিশু মুহাম্মাদ বসলে তিনি খুশি হতেন। তবে নবীজির ৮ বছর বয়সে দাদাও ইন্তেকাল করেন।

আবু তালিবের দায়িত্ব গ্রহণ: দাদার অসিয়ত অনুযায়ী নবীজি (সা.)-এর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন তাঁর আপন চাচা আবু তালিব। আবু তালিবের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকলেও তিনি নবীজিকে নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি আগলে রাখতেন এবং নিজের সাথে এক বিছানায় শোয়াতেন ও একসঙ্গে খাবার খেতেন। চাচার ঘরে আসার পর সেখানেও বরকতের প্রকাশ ঘটে, অল্প খাবারেই পুরো পরিবারের পেট ভরে যেত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শারীরিক গঠন, চরিত্র ও জীবনধারা

১. অবয়ব ও শারীরিক সৌন্দর্য (উম্মে মাবাদ-এর বর্ণনা)

হিজরতের দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর (রা.), আমির বিন ফুহাইরা (রা.) এবং পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ বিন উরাইকাত মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা 'উম্মে মাবাদ' নামক এক বৃদ্ধার তাঁবুতে বিশ্রাম নেন। খাবার চাইলে বৃদ্ধা জানান যে তাঁর কাছে কিছুই নেই। তবে তাঁবুর পাশে একটি অতি দুর্বল ও শুকনো ছাগল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেটির দুধ দোয়ানোর অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাগলটির ওলানে হাত দিতেই আল্লাহর অলৌকিক কুদরতে সেটি দুধে পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি নিজে, তাঁর সঙ্গীগণ এবং উম্মে মাবাদ তৃপ্তিসহকারে সেই দুধ পান করেন। পরে উম্মে মাবাদের স্বামী আবু মাবাদ তাঁবুতে ফিরে এই অলৌকিক ঘটনা শুনে আশ্চর্যান্বিত হন এবং আগন্তুকের পরিচয় জানতে চান। তখন উম্মে মাবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে অতুলনীয় শারীরিক বিবরণ দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বর্ণনা হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর বিবরণটি ছিল নিম্নরূপ:

"আমি এমন এক দীপ্তিময় ও পরিচ্ছন্ন মানুষ দেখেছি, যাঁর চেহারা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল। তাঁর শারীরিক গঠন ছিল অত্যন্ত নিখুঁত ও আকর্ষণীয়। তাঁর পেট অতিরিক্ত মেদবহুল ছিল না, আবার মাথাও দেহের তুলনায় ছোট ছিল না। দূর থেকে দেখলে তাঁকে সবচেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল মনে হতো, আর কাছ থেকে দেখলে মনে হতো তিনি মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে চমৎকার পুরুষ।

তাঁর চোখের মণি ছিল কুচকুচে কালো এবং সাদা অংশটি ছিল ধবধবে সাদা। চোখের পাপড়িগুলো ছিল দীর্ঘ ও ঘন, যেন প্রাকৃতিকভাবেই চোখে সুরমা লাগানো। তাঁর ভ্রু দুটি ছিল ঘন এবং ধনুকের মতো নিখুঁত বাঁকানো, তবে দুটি ভ্রু মাঝখানে জোড়া লাগানো ছিল না। তাঁর গলার গঠন ছিল দীর্ঘ ও সুন্দর, দাঁড়ি ছিল ঘন ও আকর্ষণীয়। যখন তিনি নীরব থাকতেন, তখন তাঁর মাঝে এক গম্ভীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ফুটে উঠত; আর যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর চারপাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাঁর মুখের বাণী ছিল মিষ্টি, স্পষ্ট ও যৌক্তিক— যেন সুতো থেকে ঝরে পড়া মুক্তার দানা। তিনি খুব বেশি দীর্ঘও ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না; মাঝারি গড়নের মানুষের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে আকর্ষণীয়। তাঁর চারপাশে সবসময় সঙ্গীরা (সাহাবীগণ) ঘিরে থাকত। তিনি কথা বললে সবাই পরম মনোযোগ দিয়ে শুনত, কোনো আদেশ দিলে তা পালনের

জন্য সবাই ছুটে যেত। তিনি কখনো মুখভার করে থাকতেন না, কিংবা অপ্রয়োজনীয় কথাও বলতেন না।"

২. অনন্য চরিত্র ও মহানুভবতা

আনাস (রা.)-এর চোখে: তিনি বলেন, "আমি দীর্ঘ দশ বছর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সেবা করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো আমার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে 'উহ' শব্দটিও করেননি। আমি কোনো কাজ করলে তিনি কখনো বলেননি— 'এটা কেন করলে?', আবার কোনো কাজ না করতে পারলে বা ভুলে গেলে কখনো প্রশ্ন করেননি— 'এটা কেন করলে না?'। মানুষের মধ্যে তাঁর হাত ছিল সবচেয়ে নরম ও কোমল, যা কোনো রেশমি কাপড়ের চেয়েও আরামদায়ক ছিল। আর তাঁর শরীরের ঘাম থেকে যে সুঘ্রাণ আসত, তা পৃথিবীর সবচেয়ে খাঁটি কস্তুরী বা আতরকেও হার মানাত।"

আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা: একবার এক কুখ্যাত ও রূঢ় স্বভাবের লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইল। তিনি তাকে চিনতে পেরে আয়েশা (রা.)-কে বললেন, "সে তার গোত্রের এক নিকৃষ্ট লোক।" তা সত্ত্বেও লোকটি যখন ভেতরে এল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে অত্যন্ত কোমল ও নরম ভাষায় কথা বললেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা.) এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যার খারাপ ও রূঢ় আচরণের ভয়ে মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে।"

আলী (রা.)-এর বর্ণনা: আলী (রা.)-এর পুত্র হুসাইন (রা.) তাঁর বাবার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে আলী (রা.) বলেন, "তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র মেজাজের অধিকারী। তাঁর আচরণ ছিল কোমল; তিনি কঠোর মনের বা রূঢ়ভাষী ছিলেন না। তিনি কখনো চিৎকার করে কথা বলতেন না, অশ্লীল শব্দ মুখে আনতেন না, কারও পেছনে দোষ খুঁজতেন না এবং কৃপণতা করতেন না। কেউ কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আবদার করলে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তাকে হতাশ করতেন না, আবার অবাস্তব প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনি তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখতেন— ঝগড়া-বিবাদ, অহংকার এবং অনর্থক কথা। তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও

তিনটি বিষয় পরিহার করতেন— কারও সমালোচনা করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং কারও গোপন ত্রুটি অনুসন্ধান করতেন না। তাঁর সামনে সাহাবীগণ এমন শান্ত হয়ে বসতেন, যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে।"

৩. কথা বলার চমৎকার শৈলী

হিন্দ ইবনে আবু হালা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবসময় উম্মতের চিন্তায় এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি কখনো অনর্থক বা বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথা বলার সময় পুরো মুখ অবয়বের এক্সপ্রেশন দিয়ে সুন্দরভাবে শুরু ও শেষ করতেন। তিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ (জাওয়ামিউল কালিম) বাক্যে কথা বলতেন। তাঁর প্রতিটি শব্দ বা বাক্য একে অপরের থেকে স্পষ্ট ও পৃথক থাকত, যাতে শ্রোতা সহজে বুঝতে পারে। তিনি কখনো কাউকে ছোট বা হেয় প্রতিপন্ন করতেন না।

৪. ইবাদত ও গভীর রাত জাগরণ

ইবনে আব্বাস (রা.) একবার তাঁর খালা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রী মাইমুনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি দেখেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের অর্ধেক বা তার কিছু আগে-পরে ঘুম থেকে ওঠেন। এরপর তিনি হাত দিয়ে মুখ থেকে ঘুমের ভাব দূর করেন এবং সূরা আল-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। ঝুলন্ত একটি চামড়ার পাত্র থেকে খুব সুন্দরভাবে ওযু সম্পন্ন করে তিনি সালাতে দাঁড়ান। ইবনে আব্বাস (রা.)-ও ওযু করে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত দিয়ে ইবনে আব্বাসের মাথা ধরে তাঁকে ঘুরিয়ে নিজের ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দেন। এরপর তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুন্দরভাবে দুই দুই রাকাত করে মোট ১২ রাকাত সালাত আদায় করেন এবং শেষে বিতর সালাত পড়েন। এরপর মুয়াজ্জিনের ডাক শুনে ফজরের ফরযের আগে সংক্ষেপে দুই রাকাত সুন্নত আদায় করে সালাতের জন্য মসজিদে যেতেন।

৫. আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর কুরআন নাজিল হয়েছে, আর আমি আপনাকে পড়ে শোনাব?" তিনি বললেন, "আমি অন্যের কণ্ঠ থেকে কুরআন শুনতে পছন্দ করি।" তখন আমি সূরা আন-নিসা তিলাওয়াত করতে লাগলাম। পড়তে পড়তে যখন আমি ৪১ নম্বর আয়াতে পৌঁছালাম— (অর্থ: "তখন কী অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে হাজির করব?") তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আল্লাহর ভয়ে তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইছে।

৬. অতি সাধারণ বিছানা ও জীবনযাপন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘুমানোর বিছানাটি ছিল অত্যন্ত সাধারণ। আয়েশা (রা.) এবং হাফসা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, তাঁর বিছানাটি ছিল চামড়ার তৈরি, যার ভেতরে তুলোর বদলে খেজুর গাছের আঁশ বা ছাল ভরা ছিল।

এক রাতে হাফসা (রা.) তাঁর বিছানার চটটিকে দুই ভাঁজের জায়গায় চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দেন যাতে নরম ও আরামদায়ক হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "রাতে আমার বিছানায় কী পেতেছিলে?" হাফসা (রা.) সত্য জানালে তিনি বললেন, "এটাকে আগের মতো দুই ভাঁজ করে দাও। এর অতিরিক্ত নরম ও আরামদায়ক ভাব রাতে আমার তাহাজ্জুদ সালাতে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।"

৭. বিনয়, নম্রতা ও সময় বণ্টন

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘরে ফিরতেন, তখন তাঁর সময়কে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতেন:

একটি অংশ আল্লাহর ইবাদতের জন্য।

একটি অংশ পরিবারের সুখ-দুঃখের জন্য।

একটি অংশ তাঁর নিজের বিশ্রামের জন্য।

নিজের জন্য রাখা সময়ের একটি বড় অংশ তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য রাখতেন, যাতে তাঁদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ ও দ্বীনী বিষয়গুলো সমাধান করা যায়। তিনি সমাজ ও উম্মতের সেবা করার সময় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতেন। সমাজের মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা শুনে তিনি তা সমাধান করতেন এবং সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন যেন যারা সরাসরি তাঁর কাছে আসতে পারে না, তাঁদের প্রয়োজনগুলো যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তিনি উম্মতকে বলতেন, "যে ব্যক্তি কোনো অসহায় মানুষের প্রয়োজন শাসকের কাছে পৌঁছে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার পা স্থির ও মজবুত রাখবেন।" তাঁর দরবারে কোনো চাটুকারিতা বা অপ্রয়োজনীয় আলোচনার সুযোগ ছিল না। সাহাবীগণ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান ও হেদায়েতের আলো নিয়ে তৃপ্ত হয়ে ফিরতেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবন ও আদর্শ

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিছানা ও সাদামাটা জীবন

আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা: রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ঘুমানোর বিছানাটি ছিল চামড়ার, যার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল বা আঁশ ভরা ছিল।

হাফসা (রা.)-এর ঘটনা: হাফসা (রা.)-এর কাছে একটি চট ছিল, যা তিনি দুই ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতেন। এক রাতে তিনি আরামদায়ক করার জন্য সেটি চার ভাঁজ করে দেন। পরের দিন সকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: "এটিকে পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। কারণ এর কোমলতা আমার রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।"

২. বিনয়, নম্রতা ও দৈনিক মজলিশ

ব্যক্তিগত সময় বণ্টন: রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘরে অবস্থানকালকে তিনটি ভাগে ভাগ করতেন—আল্লাহর ইবাদতের জন্য, পরিবারের জন্য এবং নিজের জন্য (যা তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতেন)।

জনকল্যাণ ও জ্ঞান বিতরণ: তিনি বিশিষ্ট সাহাবিদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান পৌঁছে দিতেন এবং যারা সরাসরি আসতে পারতেন না, তাদের প্রয়োজনগুলো তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।

৩. লজ্জা ও জীবন-জীবিকা

লজ্জাশীলতা: আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্দানাশীন কুমারী মেয়ের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন এবং কোনো কিছু অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেত।

খাদ্যাভ্যাস: আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এবং আয়েশা (রা.) উভয়েই আক্ষেপ করে বলতেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনোদিন পরপর দুই বেলা রুটি ও গোশত দ্বারা পেট ভরে আহার করতে পারেননি।

৪. পোশাক, জুতো ও আংটির বর্ণনা

পোশাক: আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জামার হাতা কবজি পর্যন্ত ছিল।

জুতো পরার নিয়ম: এক পায়ে জুতো দিয়ে হাঁটা নিষেধ; জুতো পরার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরতে হবে এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পা থেকে খুলতে হবে।

আংটি ও সিলমোহর: ইবনে উমর (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) একটি রূপার আংটি ব্যবহার করতেন যা দিয়ে তিনি সিলমোহর মারতেন এবং আংটিতে তিন লাইনে 'মুহাম্মাদ', 'রাসুল', 'আল্লাহ' খোদাই করা ছিল।

৫. প্রিয় তরকারি বা ব্যঞ্জন

পছন্দনীয় খাবার: সালমা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, নবীজি (সা.)-এর একটি প্রিয় খাবার ছিল—যবের ছাতু, যাইতুনের তেল, সামান্য মরিচের গুঁড়ো এবং গরম মশলার মিশ্রণে তৈরি ব্যঞ্জন।

খাবারের আদব: আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাতিল ও পেয়ালার অবশিষ্ট খাদ্য (চেঁছে) খেতে বেশ পছন্দ করতেন।

৬. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দিনলিপি ও দৈনিক আমল

মধ্যরাত ও ভোর

মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করতেন এবং সূরা আল-ইমরানের শেষ ১১টি আয়াত (১৯০-২০০) পাঠ করতেন।

অতিঃপর অজু করে সংক্ষিপ্ত ২ রাকাত সালাত দিয়ে তাহাজ্জুদ (কিয়ামুল লাইল) শুরু করতেন।

রাতের ১/৬ অংশ বাকি থাকতে ডান কাট হয়ে ডান হাতের তালুতে গাল রেখে সামান্য বিশ্রাম নিতেন।

বেলাল (রা.)-এর আজান শুনে আজানের জবাব দিতেন, ফযরের ২ রাকাত সুন্নাত ঘরে পড়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন।

সকাল

ফযরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে জিকির ও সাহাবিদের সাথে দ্বীনি আলোচনা করতেন।

সাহাবিদের সাথে কথোপকথন শুনতেন, তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন এবং কেউ অসুস্থ থাকলে তার খোঁজ নিতেন।

সকাল ও দুপুরের মাঝে

মসজিদ থেকে বের হয়ে একে একে সকল স্ত্রীর কক্ষে গিয়ে সালাম ও দোয়া করে পুনরায় মসজিদে ফিরে ২ রাকাত নফল সালাত পড়তেন।

সাহাবিদের সাথে আলাপ করতেন, দ্বীন শিক্ষা দিতেন, শিশুদের জন্য দোয়া করতেন এবং দূর থেকে আসা প্রতিনিধিদলের সাথে পরামর্শ করতেন।

মজলিশ শেষে সাহাবিরা জীবিকার কাজে বের হতেন, কেউ বাসায় যেতেন এবং নবীজিও কখনো বাসায় যেতেন বা মদীনার রাস্তায় হাঁটতেন।

কারও দাওয়াত থাকলে বা কেউ অসুস্থ থাকলে এই সময়টায় তাদের দেখতে বা দাওয়াত রক্ষা করতে যেতেন।

দুপুর

দুপুরের পর স্ত্রীদের মধ্যে যার ঘরে পালার দিন সেখানে প্রবেশ করে মেসওয়াক ও সালাম দিয়ে দুহার সালাত পড়ে নাস্তা করতেন।

এই সময়টায় পরিবারের সাথে একান্ত সময় কাটাতেন এবং অন্যান্য মুসলিম নারীরা এসে মেয়েদের ব্যক্তিগত মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন।

তিনি ঘরের পারিবারিক কাজ করতেন—নিজের জুতো ও কাপড় সেলাই করতেন এবং নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোহন করতেন।

যোহরের সালাতের আজান হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়টুকুতে হালকা একটু ঘুমিয়ে (কায়লুলা) নিতেন।

দুপুর ও বিকালের মাঝে

যোহরের আজানের সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে অজু করে ৪ রাকাত সুন্নাত সালাত ঘরেই আদায় করতেন।

বেলাল (রা.) জামায়াতের জন্য ডাক দিলে মসজিদে গিয়ে সালাত শেষে সাহাবিদের দিকে ঘুরে বসে নসিহত করতেন।

এরপর ঘরে ফিরে যোহরের ২ রাকাত সুন্নাত পড়ে পুনরায় মসজিদে গিয়ে আসর পর্যন্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন।

বিকাল

আসরের সালাত আদায় করে সাহাবিদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং আসরের পর যোহরের তুলনায় অনেক কম কথা বা খুব সংক্ষিপ্ত নসিহত করতেন।

আসরের সালাত শেষ করে একে একে সকল স্ত্রীর সাথে দেখা করে কুশল বিনিময় করতেন এবং যার ঘরে পালার দিন সেখানে গিয়ে অবস্থান করতেন।

কখনো কখনো আসরের পর সাহাবিরা কোনো দাওয়াত দিলে তিনি সেই দাওয়াত কবুল করতে যেতেন।

সন্ধ্যা ও রাত

মাগরিবের সালাত নবীজি সংক্ষিপ্ত করতেন এবং ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করে রাতের খাবার গ্রহণ করতেন।

তবে সিয়াম বা রোজা থাকলে মাগরিবের সালাতের পূর্বেই ইফতার সম্পন্ন করে নিতেন।

পর্যাপ্ত খাবার থাকলে অন্তত ১০ জন সাহাবিকে সাথে নিয়ে খেতেন এবং খাওয়ার সময় তাদের দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন।

রাতে ঘুমের আগে

এশার সালাতের পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু নবীজি ঘরেই কাটাতেন এবং এশার সালাত কিছুটা দেরিতে আদায় করতেন।

এশার সালাতের পর সাহাবিদের সাথে খুব কম দিনই কথা বলতেন এবং সালাত শেষে ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন।

এরপর স্ত্রীর সাথে গল্প করতেন, মাঝে মাঝে নিষ্ঠ সাহাবিদের বা আনসারদের সাথে সময় কাটাতেন এবং পবিত্রতা অর্জন করে ঘুমের দোয়া পড়ে ঘুমাতেন।

রাতে ঘুম ভেঙে গেলে পুনরায় ঘুমানোর পূর্বে আবারও মেসওয়াক করে নিতেন এবং মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন।

অধ্যায় ৩: কিশোর ও যৌবনকাল এবং নবুওয়াত পূর্ব জীবন

৩.১ সিরিয়া সফর ও পাদ্রী বুহাইরার ঘটনা (The Journey to Syria and Monk Bahira)

নবীজি (সা.)-এর বয়স যখন আনুমানিক ১২ বছর, তখন চাচা আবু তালিব কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নেন। আবু তালিব তাঁর প্রিয় ভাতিজাকে মক্কায় একা রেখে যেতে চাননি, তাই কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কিশোর মুহাম্মাদ (সা.)-কে নিজের সাথে সফরে নিয়ে নেন।

কাফেলার বুসরায় আগমন ও বুহাইরার পর্যবেক্ষণ: কাফেলাটি যখন সিরিয়ার সীমানাবর্তী 'বুসরা' নামক স্থানে পৌঁছায়, তখন সেখানে 'বুহাইরা' নামক এক খ্রিষ্টান পাদ্রী (Monk) থাকতেন, যিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে পারদর্শী ছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী, বুহাইরা গির্জা থেকে লক্ষ্য করলেন যে, কাফেলাটি যখন এগিয়ে আসছে, তখন একখণ্ড মেঘ একটি বিশেষ কিশোরের মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছে এবং সে যখন একটি গাছের নিচে গিয়ে বসল, তখন গাছের ডালপালাগুলো তার দিকে ঝুঁকে ছায়া বাড়িয়ে দিল।

ভোজের আমন্ত্রণ ও নিদর্শনের সত্যতা: বুহাইরা কখনো কুরাইশ কাফেলাকে দাওয়াত দিতেন না, কিন্তু এবার তিনি পুরো কাফেলার জন্য বড় ভোজের আয়োজন করলেন। কাফেলার সবাই বুহাইরার গির্জায় আসলেও কিশোর মুহাম্মাদ (সা.)-কে ছোট মনে করে মালপত্রের পাহারায় রেখে আসেন। বুহাইরা সবার দিকে তাকিয়ে কিতাবের ভবিষ্যৎ বাণীর কোনো লক্ষণ না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কেউ কি বাকি আছে?" আবু তালিব বললেন, "হ্যাঁ, আমার এক ভাতিজা মালপত্রের কাছে আছে।" তাকে ডেকে আনার পর বুহাইরা তাঁর কিতাবের বর্ণনার সাথে নবীজি (সা.)-এর চেহারা, চোখ এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল খুঁজে পান।

নবুওয়াতের সীলমোহর ও আবু তালিবকে সতর্কীকরণ: বুহাইরা নবীজি (সা.)-এর পিঠের দুই কাঁধের মাঝখানে 'মোহরে নবুওয়াত' (নবুওয়াতের সীলমোহর) দেখতে পান। এরপর তিনি আবু তালিবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বালকটি আপনার কী হয়?" আবু তালিব স্নেহের বশে বললেন, "এটি আমার ছেলে।" বুহাইরা বললেন, "না, এটি আপনার ছেলে হতে পারে না। এই বালকের পিতার বেঁচে থাকার কথা নয়।"

আবু তালিব তখন সত্য স্বীকার করে বললেন, "সে আমার ভাতিজা, তার জন্মের আগেই পিতা মারা গেছেন।" বুহাইরা তখন বললেন, "আপনি আপনার ভাতিজাকে নিয়ে দ্রুত মক্কায় ফিরে যান এবং ইহুদিদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করুন। আল্লাহর কসম! ইহুদিরা যদি তাকে দেখতে পায় তবে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। কারণ আপনার এই ভাতিজার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত গৌরবময়।" এই কথা শুনে আবু তালিব সিরিয়ার ব্যবসা দ্রুত শেষ করে নবীজিকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন।

৩.২ হারবুল ফুজ্জার এবং হিলফুল ফুজুল (The Sacrilegious War and League of Virtues)

কিশোর বয়স পার হয়ে যৌবনে পদার্পণের সময় নবীজি (সা.) আরবের সামাজিক অন্যায় ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কুফল সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

হারবুল ফুজ্জার (অন্যায় সমর): নবীজি (সা.)-এর বয়স যখন প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে, তখন মক্কার কুরাইশ ও কিনানা গোত্রের সাথে কায়েস গোত্রের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জিলকদ নামক পবিত্র মাসে (যে মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল) অন্যায়ভাবে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলে একে 'হারবুল ফুজ্জার' বা অন্যায় সমর বলা হয়। সীরাত ইবনে হিশামে উল্লেখ আছে, নবীজি (সা.) এই যুদ্ধে সরাসরি কোনো অস্ত্র চালাননি বা রক্তপাত করেননি; বরং তিনি কেবল চাচাদের দিকে ধেয়ে আসা শত্রুর তীরগুলো কুড়িয়ে তাদের হাতে তুলে দিতেন। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ব্যাপক প্রাণহানি নবীজির কোমল মনে গভীর রেখাপাত করে।

ফিজার যুদ্ধকে 'পাপের যুদ্ধ' বলার কারণসমূহ:

ইতিহাসে ফিজার যুদ্ধকে (হারবুল ফিজার) 'অন্যায় বা পাপের যুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করার পেছনে প্রধান দুটি কারণ ছিল:

১. এই যুদ্ধে আরবের নিষিদ্ধ বা পবিত্র মাসগুলোর অবমাননা করা হয়েছিল। আরবরা যে সময় ও স্থানগুলোকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করত, সেই পবিত্রতার দেয়াল ভেঙে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হয়।

২. যুদ্ধের উভয় পক্ষই আল্লাহর বিধান অমান্য করে চরম অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়েছিল এবং এই রক্তপাতের পেছনে কোনো ন্যায়সঙ্গত বা বৈধ কারণ ছিল না।

হিলফুল ফুজুল (আর্তমানবতার সেবা):

যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখার পর নবীজি (সা.) সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মজলুমদের সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। 'Ar-Raheeq Al-Makhtum'-er বিবরণ অনুযায়ী, মক্কার বনু হাশেম, বনু মুত্তালিব, বনু যুহরাহ প্রভৃতি গোত্রের কিছু বিবেকবান মানুষ আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে সমবেত হন। যুবক মুহাম্মাদ (সা.)-এর সক্রিয় উদ্যোগে ও উৎসাহে সেখানে একটি শান্তি সংঘ বা চুক্তি গঠিত হয়, যা ইতিহাসে "হিলফুল ফুজুল" নামে পরিচিত। এই সংঘের মূল অঙ্গীকার ছিল: ১. মক্কায় বসবাসকারী বা বাইরে থেকে আসা কোনো ব্যক্তির ওপর জুলুম হতে দেওয়া হবে না। ২. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মজলুমকে সর্বাত্মক সাহায্য করা হবে। ৩. সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে। নবীজি (সা.) এই চুক্তিকে এতটা পছন্দ করতেন যে, নবুওয়াত পাওয়ার পরও তিনি বলতেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে আমি এমন একটি চুক্তিতে উপস্থিত ছিলাম, যার পরিবর্তে আমাকে লাল উট দেওয়া হলেও আমি তা নিতাম না। আজ ইসলামেও যদি কেউ আমাকে এমন চুক্তির দিকে ডাকে, তবে আমি তাতে সাড়া দেব।"

হিলফুল ফুজুল' নামকরণের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস:

সীরাত গ্রন্থসমূহে এই শান্তিচুক্তির নামকরণের পেছনে মূলত দুটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

১. এটি ছিল সমাজে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার একটি দৃঢ় অঙ্গীকারনামা। এ কারণে এর নাম দেওয়া হয় 'হিলফুল ফুজুল', যার অর্থ **'ন্যায়ের অঙ্গীকার'**।

২. সীরাতে ইবনে হিশামের বরাতে সীরাতে মুস্তফা গ্রন্থে আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (রহ.) লিখেছেন— প্রাচীন আরবে গোত্রীয় যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলা থেকে মানুষকে বাঁচাতে 'ফজল ইবনে ফুজালা', 'ফজল ইবনে উদায়া' এবং 'ফুজায়েল ইবনে হারিস' নামের তিন ব্যক্তি একটি শান্তিচুক্তি করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারে সেই চুক্তিকে 'হিলফুল ফুজুল' বলা হতো। ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতার পর আরবের নেতারা মূলত সেই পুরনো আদর্শের চুক্তিটিকেই নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং নাম অপরিবর্তিত রাখেন।

নবুওয়াত পাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ এই চুক্তির কথা স্মরণ করে গর্বের সাথে বলেছিলেন: *"আজকেও যদি কোনো মজলুম ব্যক্তি 'হে হিলফুল ফুজুলের সদস্যবৃন্দ' বলে আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে আমি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেব।"*

হিলফুল ফুজুল বা এই শান্তিচুক্তি থেকে আমাদের শিক্ষণীয়:

১. সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবকল্যাণ:

একজন মুসলিম হিসেবে সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখে সবসময় পাশে দাঁড়ানো উচিত। সমাজের যেকোনো কল্যাণকর কাজে (যদি তা ইসলামের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়) সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া জরুরি— তা পুরোপুরি ধর্মীয় কোনো বিষয় না হলেও।

২. তরুণ সমাজের অগ্রণী ভূমিকা:

এই ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিতে অংশ নেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। সুতরাং, আমাদের তরুণদেরও উচিত সমাজের উন্নয়ন ও বড় বড় সংকট নিরসনে মুরুব্বি হওয়ার অপেক্ষায় বসে না থেকে, এখন থেকেই সচেতন নাগরিক হিসেবে কাজ শুরু করা।

৩. যুবসমাজকে কাজের সুযোগ করে দেওয়া:

তৎকালীন আরবের প্রভাবশালী নেতা আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের বাড়িতে সমাজের নীতি-নির্ধারকেরা একত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে যুবক মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপস্থিতিতে তাঁরা কোনো দ্বিধা বা আপত্তি করেননি, বরং তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এখান থেকে আমাদের সমাজের মুরুব্বি বা সিনিয়রদের শেখার আছে যে, কল্যাণমূলক কাজে তরুণদের অবহেলা না করে তাঁদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা উচিত।

৩.৩ 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসী উপাধি লাভ (The Title of 'Al-Ameen')

যৌবনকালে আরবের পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যেও মুহাম্মাদ (সা.) এক অনন্য, নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মদ্যপান, জুয়া, ব্যভিচার বা কোনো প্রকার জাহেলী পাপাচার তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তাঁর অসাধারণ সততা, আমানতদারী, সত্যবাদিতা এবং প্রতিশ্রুতিরক্ষার কারণে মক্কার শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত। পুরো মক্কাবাসী সমস্বরে তাঁকে 'আল-আমীন' (পরম বিশ্বস্ত) এবং 'আস-সাদিক' (সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত

করে। মক্কার লোকেরা তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ ও আমানত নিশ্চিন্তে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত।

৩.৪ খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহ (Marriage to Khadijah)

মুহাম্মাদ (সা.)-এর এই সততা ও 'আল-আমীন' খ্যাতির কথা মক্কার সবচেয়ে ধনী, সম্মানিত ও কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত নারী হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের কানে পৌঁছায়। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে পুরুষদের মূলধন দিয়ে সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন।

সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফর: খাদিজা (রা.) নবীজি (সা.)-এর সততার কথা শুনে তাঁকে দ্বিগুণ লভ্যাংশের বিনিময়ে তাঁর বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব দেন। নবীজি (সা.) চাচার পরামর্শে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং খাদিজার বিশ্বস্ত দাস 'মাইসারা'-কে সাথে নিয়ে সিরিয়া সফরে যান। সফরে নবীজির নিখুঁত ব্যবসা পরিচালনা, চমৎকার আচরণ এবং অলৌকিক বরকত দেখে মাইসারা মুগ্ধ হন। ব্যবসা শেষে কাফেলা মক্কায় ফিরলে অন্য যে কোনো বারের চেয়ে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত হয়।

বিবাহের প্রস্তাব ও সম্পন্নকরণ: মাইসারা মক্কায় ফিরে হযরত খাদিজার কাছে নবীজির অসাধারণ চরিত্র, সততা এবং সফরের অলৌকিক ঘটনাসমূহ (যেমন- ফেরেশতাদের মেঘের সাহায্যে ছায়া দেওয়া) বিস্তারিত বর্ণনা করেন। খাদিজা (রা.) নবীজির মহান চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বান্ধবী নাফিসার মাধ্যমে নিজের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নবীজি (সা.) তাঁর চাচাদের সাথে পরামর্শ করে এই প্রস্তাবে সম্মত হন।

মোহরানা ও দাম্পত্য জীবন: সীরাত ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী, আবু তালিব, হামযাহসহ বনু হাশিমের প্রধানদের উপস্থিতিতে আবু তালিব নিজে বিয়ের খুতবা পড়েন। ২০টি উট (কারো মতে ৫০০ দিরহাম) মোহরানার বিনিময়ে এই ঐতিহাসিক বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় নবীজি (সা.)-এর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং হযরত খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। খাদিজা (রা.) ছিলেন নবীজির প্রথমা স্ত্রী এবং তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় নবীজি দ্বিতীয় কোনো বিয়ে করেননি। ইব্রাহীম ছাড়া নবীজির বাকি সব সন্তান (কাসেম, যয়নব, রুকাইয়াহ, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা, আব্দুল্লাহ) খাদিজা (রা.)-এর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যৌবনকাল: কাবা গৃহ পুনর্নির্মাণ ও নবুওয়াত লাভ

১. কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণ ও হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কুরাইশরা কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। (উল্লেখ্য, ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর জীবনের বড় কোনো ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে তেমন পাওয়া যায় না)।

পুনর্নির্মাণের কারণ:

তখনকার সময়ে কাবা ঘরের চারপাশে শুধু দেয়াল ছিল, কোনো ছাদ ছিল না। এই সুযোগে চোরেরা ভেতরে ঢুকে মূল্যবান সম্পদ চুরি করে নিয়ে যেত। হযরত ইসমাইল (আ.)-এর আমল থেকে কাবার উচ্চতা ছিল মাত্র ৯ হাত। তাছাড়া কাবা ঘরটি নিচু এলাকায় হওয়ায় বৃষ্টির পানি ভেতরে ঢুকে যেত। দীর্ঘদিনের পুরোনো হওয়ায় দেয়ালে ফাটল ধরেছিল এবং তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই বছর মক্কায় এক ভয়াবহ বন্যা হলে দেয়ালগুলোর আরও ক্ষতি হয়। (অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, অসতর্কতাবশত কাবা ঘরে আগুন লেগে দেয়ালে ফাটল ধরেছিল)। এই পরিস্থিতিতে কাবার মর্যাদা রক্ষায় কুরাইশরা তা নতুন করে গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও অলৌকিক ঘটনা:

রোমান সম্রাটের পাঠানো একটি জাহাজ ইয়েমেনের দিকে যাওয়ার পথে ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে জেদ্দা বন্দরে এসে পৌঁছায়। জাহাজটিতে মূল্যবান কাঠ, পাথর ও একজন দক্ষ কারিগর (যার নাম ছিল বাকুম) ছিলেন। কুরাইশরা সেই মালামাল কিনে কারিগর বাকুমকে মক্কায় নিয়ে আসে।

যখন কাবা ভাঙার কাজ শুরু হবে, তখন ওহাব ইবনে আমর মাখযুমী (রাসূল ﷺ-এর পিতার মামা) কাবার একটি পাথর সরাতে গেলে পাথরটি অলৌকিকভাবে হাত থেকে ছুটে নিজের জায়গায় ফিরে যায়। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে কুরাইশ নেতারা সিদ্ধান্ত

নেন যে, কাবার নির্মাণকাজে কেবল বৈধ ও হালাল টাকা ব্যবহার করা হবে। সুদ, জুয়া বা পতিতা বৃত্তির মতো কোনো হারাম উপার্জনের টাকা এতে লাগানো হবে না।

বিবাদ ও রাসূল ﷺ-এর প্রজ্ঞা:

প্রথম দিকে কাবার দেয়াল ভাঙতে সবাই ভয় পাচ্ছিল। অবশেষে ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সাহস করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রথম হাত দেয়। পরদিন তার কোনো ক্ষতি না হওয়ায় সবাই মিলে কাবা ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজ শুরু করে। মক্কার গোত্রগুলোর মধ্যে সম্মান বজায় রাখতে কাবার চারপাশের দেয়ালগুলো বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দুটি দেয়াল পায় বনু আবদে মানাফ ও বনু মাখযুম।

সব কাজ ঠিকঠাক চললেও 'হাজরে আসওয়াদ' (পবিত্র কালো পাথর) স্থাপনের সময় দুই প্রধান গোত্রের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়। উভয় পক্ষই এই ঐতিহাসিক সম্মানের অংশীদার হতে চাচ্ছিল। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ রূপ নেয় যে যুদ্ধের উপক্রম হয়। এই সংকটময় মুহূর্তে মক্কার সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আবু উমাইয়া ইবনে মুগিরা একটি চমৎকার সমাধান দেন। তিনি বলেন, "আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন, তিনিই এই বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন।" সবাই এই প্রস্তাবে রাজি হলো।

পরদিন সকালে দেখা গেল, সবার আগে যিনি প্রবেশ করেছেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁকে দেখে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল এবং বলল, "তিনি 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত), আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে একটি চাদর বিছিয়ে তার ওপর হাজরে আসওয়াদ রাখলেন এবং বিবদমান গোত্রগুলোর প্রধানদেiর চাদরের কোণ ধরে পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন। এরপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি দেয়ালে স্থাপন করলেন। এভাবে তাঁর বুদ্ধিমত্তায় একটি নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হলো।

২. হেরা গুহায় নির্জনতা ও প্রথম ওহী লাভ

নবুওয়াতের কাছাকাছি সময়ে (প্রায় ৩৭ বছর বয়স থেকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার কোলাহলময় পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে একাকী সময় কাটাতে পছন্দ করতে লাগলেন। মক্কা থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে 'হেরা' পর্বতের একটি ছোট গুহায় (যার দৈর্ঘ্য ৪ হাত এবং প্রস্থ পৌনে ২ হাত) তিনি খাবার ও পানি নিয়ে চলে যেতেন। স্বজাতির মূর্তিপূজা এবং অনৈতিক জীবনযাপন তাঁর মনে ভীষণ কষ্ট দিত। তিনি এই গুহায় পুরো রমজান মাস কাটাতেন এবং সৃষ্টিজগত ও এর পেছনের মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে গভীর ধ্যান করতেন। এটি আসলে মহান আল্লাহর একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর নবীকে ভবিষ্যতের গুরুদায়িত্বের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন।

প্রথম ওহী অবতরণ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হলো, তখন রমজান মাসের এক রাতে ফেরেশতা জিবরীল (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে হেরা গুহায় আগমন করলেন। জিবরীল (আ.) এসে তাঁকে বললেন, "পড়ুন।" রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" তখন জিবরীল (আ.) তাঁকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলেন এবং আবার বললেন, "পড়ুন।" রাসূল ﷺ আবারও একই উত্তর দিলেন। এভাবে তিনবার আলিঙ্গন করার পর জিবরীল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন:

"পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে..."

খাদিজা (রা.) ও ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের ভূমিকা:

এই অভাবনীয় ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন এবং স্ত্রী খাদিজা (রা.)-কে বললেন, "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" কিছুটা শান্ত হয়ে

তিনি গুহার সব ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন। তখন খাদিজা (রা.) অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন:

"কখনো না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায় মানুষের দায়িত্ব নেন, দরিদ্রদের সাহায্য করেন, মেহমানদের সেবা করেন এবং সত্যের পথে যেকোনো বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ান।"

(হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর মতে, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে মানবজাতির মধ্যে প্রথম ঈমান এনেছিলেন হযরত খাদিজা রা.)।

এরপর খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে নিয়ে যান, যিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল শাস্ত্রের একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, "ইনি তো সেই 'নামূস' (বার্তা বাহক ফেরেশতা জিবরীল), যিনি মূসা (আ.)-এর কাছে এসেছিলেন। আফসোস! তোমার জাতি যখন তোমাকে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন যদি আমি যুবক ও জীবিত থাকতাম, তবে তোমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করতাম।" রাসূল ﷺ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, অতীতে যখনই কোনো নবী সত্যের বাণী নিয়ে এসেছেন, তাঁর জাতি তাঁর ওপর নির্যাতন করেছে এবং দেশছাড়া করেছে।" (এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল মনে-প্রাণে রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাস এনেছিলেন)।

প্রথম ওহী নাজিলের সময়:

রাসূল ﷺ-এর বয়স ৪০ বছর হওয়ার পর রবিউল আউয়াল মাসে স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হলেও সশরীরে প্রথম ওহী নাজিলের সঠিক তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.) সমস্ত সহীহ হাদীস ও পঞ্জিকা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ২১শে রমজান সোমবারের রাতে প্রথম ওহী নাজিল হয়েছিল। কারণ

কুরআনের আয়াত অনুযায়ী ওহী রমজান ও কদরের রাতে নাজিল হয়েছে, আর সেই বছর রমজানের সোমবারে ২১ তারিখ পড়েছিল।

৩. ওহী সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা ও পুনরায় সূচনা

প্রথম ওহী আসার পর কিছুদিনের জন্য ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায় (এই বিরতির সময়কাল নিয়ে ৩ দিন, ১০ দিন বা তার বেশি সময়ের মতভেদ আছে, তবে ১০ দিনের মতটিই বেশি নির্ভরযোগ্য)। ওহী বন্ধ থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ চিন্তিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি এতটাই মানসিক কষ্টে ভুগতেন যে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিজেকে ফেলে দেওয়ার কথাও ভাবতেন। কিন্তু যখনই তিনি পাহাড়ে যেতেন, জিবরীল (আ.) আবির্ভূত হয়ে বলতেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর সত্য নবী।" এতে তাঁর মন শান্ত হতো।

ওহী সাময়িক বন্ধ থাকার কারণ:

ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, প্রথমবার ওহী নামার তীব্রতায় রাসূল ﷺ ভীষণ ভয় ও বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মানসিক ভারসাম্য ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্যই আল্লাহ কিছুদিনের বিরতি দিয়েছিলেন, যাতে তিনি পরবর্তী ওহীর জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

পুনরায় ওহী আগমন:

একদিন রাসূল ﷺ পথ চলছিলেন, এমন সময় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাকিয়ে দেখলেন, হেরা গুহায় আসা সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। তিনি আবারও ভয়ে ঘরে ফিরে চাদর মুড়ি দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম ৭টি আয়াত নাজিল করলেন:

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন। আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।"

এর পর থেকে ওহী আসার ধারাবাহিকতা নিয়মিত হয়ে যায়। (কোনো কোনো বর্ণনায় সূরা মুযযাম্মিল আগে নাজিল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে)।

৪. গোপন দাওয়াত ও 'দারুল আরকাম'

আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন। কুফর ও শিরকে ডুবে থাকা সমাজে একবারে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে বড় বিপর্যয় আসতে পারত। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে একটি শক্তিশালী ও বিশ্বাসী দল তৈরির উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত গোপনে তাঁর নিকটাত্মীয় ও বিশ্বস্ত বন্ধুদের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ সময় তাঁদের ওপর দৈনিক দুই রাকাত করে সালাত ফরয করা হয় (যা পরে চার রাকাত করা হয়)।

যখন মুসলমানের সংখ্যা কিছুটা বাড়ল, তখন সাফা পাহাড়ের পাশে সাহাবী আরকাম (রা.)-এর বাড়িকে দাওয়াতের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, যা ইতিহাসে 'দারুল আরকাম' নামে পরিচিত। সেখানে মুসলমানরা গোপনে সালাত আদায় করতেন এবং নবীজী ﷺ তাঁদের কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। মক্কী জীবনের এই প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে মূলত তাওহীদ, জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা, উত্তম চরিত্র গঠন এবং কাফেরদের অত্যাচারের মুখে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেওয়া হতো।

প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীগণ:

১. খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.) [নারীদের মধ্যে প্রথম]

২. ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল (রা.) [বয়স্কদের মধ্যে]

৩. আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) [শিশুদের মধ্যে প্রথম]

৪. আবু বকর সিদ্দিক (রা.) [স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে প্রথম]

৫. যায়েদ বিন হারিসা (রা.) [মুক্ত দাসের মধ্যে প্রথম]

আবু বকর (রা.)-এর দাওয়াতে উম্মতের সেরা কিছু মানুষ ইসলাম আনেন:

উসমান ইবনে আফফান (রা.)

জুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.)

এরপর পর্যায়ক্রমে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, উসমান ইবনে মাযউন, সাঈদ বিন যায়েদ, ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (ওমর রা.-এর বোন), আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন। দাসদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত বিলাল (রা.), খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.), আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) এবং তাঁর পিতামাতা (ইয়াসির ও সুমাইয়া রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. প্রথম ওহী ও সূচনালগ্ন থেকে আমাদের শিক্ষণীয়:

১. আধ্যাত্মিক নিভৃতি ও মধ্যপন্থা: জীবনের ব্যস্ততা ও ক্লান্তি যখন আমাদের গ্রাস করে, তখন কিছুদিনের জন্য নির্জনে গিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবা এবং ইবাদতে মগ্ন হওয়া উচিত। ইসলাম বৈরাগ্যবাদ সমর্থন করে না, আবার শুধু দুনিয়ার কাজে ডুবে থেকে আত্মাকে অন্ধ করাও পছন্দ করে দেয় না। কর্ম ও ইবাদতের মাঝে ভারসাম্য রাখাই মূল আদর্শ।

২. মানবসেবা ও নিরাপত্তা: মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহর আজাব ও দুনিয়াবী লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, যেমনটি খাদিজা (রা.) নবীজীকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন।

৩. পারিবারিক ও সামাজিক পরামর্শ: জীবনে কোনো বড় প্রাপ্তি বা সংকট এলে সবার আগে দ্বীনদার ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সাথে এবং তারপর সমাজের অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী মানুষের সাথে তা শেয়ার করা উচিত।

৪. জ্ঞানভিত্তিক উম্মাহ: মুসলিম উম্মাহর পথচলা শুরু হয়েছে "পড়ো" শব্দ দিয়ে। অথচ আজ মুসলিমরাই পড়াশোনায় পিছিয়ে। দুনিয়া ও আখেরাতে নিজেদের গৌরব ফিরে পেতে হলে আমাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে।

৫. পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন (ইলম, আমল ও দাওয়াত): প্রথম নাজিল হওয়া তিনটি সূরার (আলাক, মুযযাম্মিল, মুদ্দাসসির) ক্রমানুসারে বোঝা যায়— একজন মুসলিমের প্রথম কাজ হলো সঠিক 'জ্ঞান' (ইলম) অর্জন করা, তারপর সেই অনুযায়ী 'আমল' করা (রাতের সালাত) এবং সবশেষে মানুষকে 'দাওয়াত' দেওয়া। জ্ঞান ছাড়া আমল যেমন অর্থহীন, আমল ছাড়া দাওয়াতও তেমনি নিষ্ফল।

৩.৫ কাবা গৃহ পুনর্নির্মাণ ও হাজরে আসওয়াদ স্থাপন বিতর্ক (Reconstruction of Kaaba and Arbitration)

নবীজি (সা.)-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন মক্কায় এক ভয়াবহ ঢল (প্লাবন) নামে, যার ফলে কাবা ঘরের দেয়াল ফেটে যায় এবং ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। কুরাইশরা পবিত্র কাবা ঘর ভেঙে নতুন করে মজবুত পাথর দিয়ে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়।
হালাল উপার্জনের শর্ত: আর-রাহীকুল মাখতূম-এ উল্লেখ আছে, কুরাইশরা কাবা নির্মাণের ক্ষেত্রে শর্ত দিয়েছিল যে, এখানে কেবল সম্পূর্ণ হালাল টাকা ব্যবহার করা হবে; কোনো সূদ, পতিতালয়ের আয় বা অন্যায্য লুণ্ঠনের টাকা এতে লাগানো যাবে না। হালাল ফান্ডের স্বল্পতার কারণে তারা কাবা ঘরের উত্তর দিকের কিছু অংশ (যা হাতিমে কাবা বা হিজরে ইসমাইল নামে পরিচিত) মূল দেয়ালের বাইরে রেখে দেয়।

হাজরে আসওয়াদ নিয়ে বিরোধ: কাবার দেয়াল যখন পুনর্নির্মাণ করে 'হাজরে আসওয়াদ' (পবিত্র কালো পাথর) স্থাপন করার উচ্চতায় পৌঁছাল, তখন গোত্রগুলোর মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দিল। প্রতিটি প্রধান গোত্রই চাইল এই বরকতময় পাথরটি নিজেদের হাতে স্থাপন করে ইতিহাসের অংশ হতে। বিরোধ এতটাই তীব্র রূপ নিল যে, তরবারি কোষমুক্ত হলো এবং আরবে আবার একটি দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলো। বনু আব্দে দারের লোকেরা রক্তে হাত ডুবিয়ে কসম খেল যে তারা ছাড়া কেউ এটি স্থাপন করতে পারবে না। এভাবে চার-পাঁচ দিন কাজ বন্ধ রইল।

বিচক্ষণ সমাধান: এই সংকটময় মুহূর্তে কুরাইশদের প্রবীণ নেতা আবু উমাইয়াহ ইবনে মুগীরাহ এক চমৎকার প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, "আগামীকাল প্রত্যূষে পবিত্র কাবার বাব-উস-সালাম (বা নির্দিষ্ট দরজা) দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে, তাকেই আমরা আমাদের এই বিরোধের সালিশ বা মধ্যস্থতাকারী মানব।" সবাই এই প্রস্তাবে রাজি হলো।

আল-আমীনের ফয়সালা: পরদিন সকালে সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল। দেখা গেল, সবার আগে যিনি প্রবেশ করছেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মহানুভব মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁকে দেখেই সমবেত সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, "হাযাল আমীন, রাযীনা বিহি!" (এই তো আল-আমীন, আমরা সবাই তাঁর ওপর সন্তুষ্ট!)।

নবীজির অনন্য কৌশল: নবীজি (সা.) বিরোধের কথা শুনে অত্যন্ত শান্ত মাথায় একটি চাদর বিছাতে বললেন। তিনি নিজের পবিত্র হাতে হাজরে আসওয়াদ পাথরটি তুলে চাদরের মাঝখানে রাখলেন। এরপর বিরোধে লিপ্ত প্রতিটি প্রধান গোত্রের নেতাদের ডেকে বললেন, "আপনারা সবাই চাদরের চার কোণ ধরুন এবং একসাথে পাথরটিকে ওপরে তুলুন।" নেতারা চাদর ধরে পাথরটিকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুললে নবীজি (সা.) নিজের মোবারক হাত দিয়ে পাথরটি কাবার দেয়ালে যথাস্থানে স্থাপন করে দিলেন। এই অভূতপূর্ব ও বিচক্ষণ ফয়সালার কারণে আরবের সমস্ত গোত্র সন্তুষ্ট হলো এবং এক নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে পুরো আরব জাতি রক্ষা পেল।

অধ্যায় ৪: নবুওয়াত লাভ, গোপন ও প্রকাশ্য দাওয়াত

৪.১ হেরা গুহায় ধ্যানমগ্নতা ও প্রথম ওহী নাযিল (Meditation in Cave Hira and the First Revelation)

নবীজি (সা.)-এর বয়স যখন প্রায় ৪০ বছর, তখন তাঁর মধ্যে নির্জনতা ও একাকীত্ব যাপনের এক গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তিনি মক্কার কোলাহল থেকে দূরে জাবালে নূরের (আলোর পাহাড়) চূড়ায় অবস্থিত 'হেরা গুহা'-তে নির্জনবাস শুরু করেন।

ধ্যানমগ্নতা: 'Ar-Raheeq Al-Makhtum'-er বর্ণনা অনুযায়ী, নবীজি (সা.) সামান্য কিছু ছাতু ও পানি সাথে নিয়ে টানা কয়েক দিন হেরা গুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তিনি মূলত হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রাচীন তাওহীদী নীতি অনুসারে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং আরবের সামাজিক অবক্ষয় থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেন।

ওহী নাযিল ও জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন: খ্রিষ্টীয় ৬১০ সালের রমাযান মাসের এক রাতে (লাইলাতুল কদর), যখন নবীজি (সা.) ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর কাছে আল্লাহর প্রধান ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) মানববেশে আত্মপ্রকাশ করেন। জিবরাঈল (আ.) এসে নবীজিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ইকরা" (পড়ুন)। নবীজি (সা.) বিস্ময় ও ভয়ের সাথে উত্তর দিলেন, "মা আনা বি ক্বারী" (আমি তো পড়তে জানি না)।

বক্ষে চাপ দেওয়া ও প্রথম আয়াত নাযিল: সীরাত ইবনে হিশামে উল্লেখ আছে, নবীজির এই উত্তরের পর জিবরাঈল (আ.) নবীজিকে জড়িয়ে ধরে বুকে এমন জোরে চাপ দিলেন যে নবীজির কষ্ট অনুভব হলো। এরপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, "পড়ুন"। নবীজি আবারও বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও নবীজিকে বুকে জড়িয়ে ধরে তীব্র চাপ দিলেন এবং ছেড়ে দিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

"পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (সূরা আল-আলাক: ১-৫)

"পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (সূরা আল-আলাক: ১-৫)

নবীজি (সা.) এই আয়াতগুলো মুখস্থ করলেন এবং জিবরাঈল (আ.) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ওহী এবং নবীজি (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির মহত্তম মুহূর্ত।

৪.২ খাদিজা (রা.)-এর সান্ত্বনা ও ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের ভবিষ্যৎ বাণী (Comfort of Khadijah and Prediction of Waraka)

প্রথম ওহী নাযিলের পর নবীজি (সা.) তীব্র কাঁপুনী ও ভয় নিয়ে হেরা গুহা থেকে নেমে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। অলৌকিক এই অভিজ্ঞতায় তিনি শারীরিকভাবে এতটাই বিচলিত ছিলেন যে, ঘরে ঢুকেই স্ত্রী খাদিজা (রা.)-কে বললেন, "যাম্মিলূনী, যাম্মিলূনী" (আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত করো, আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত করো)।

হযরত খাদিজার ঐতিহাসিক সান্ত্বনা: খাদিজা (রা.) তাঁকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। নবীজির ভয় কিছুটা কমলে তিনি হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের আশঙ্কার কথা জানালেন। এই কঠিন সময়ে হযরত খাদিজা (রা.) ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে যুগান্তকারী ও সান্ত্বনাদায়ক বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন:

"কখনোই নয়! আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়-দরিদ্রদের বোঝা বহন করেন, অভাবীদের উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং হকের পথে আসা বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।"

"কখনোই নয়! আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়-দরিদ্রদের বোঝা বহন করেন, অভাবীদের উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং হকের পথে আসা বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।"

ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গমন: নবীজির মনকে শান্ত করার জন্য খাদিজা (রা.) তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে যান। ওয়ারাকা ছিলেন বৃদ্ধ ও অন্ধ, যিনি জাহেলী যুগে মূর্তিপূজা ছেড়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল কিতাব লিখতে পারতেন।

ভবিষ্যৎ বাণী ও সতর্কীকরণ: ওয়ারাকা নবীজির মুখ থেকে হেরা গুহার সব ঘটনা শোনার পর আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, "এটি তো সেই 'নামূস' (পবিত্র রহস্যবাহী ফেরেশতা জিবরাঈল), যাঁকে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন!" তিনি আফসোস করে আরও বললেন, "হায়! আপনার দাওয়াতের দিনগুলোতে যদি আমি যুবক থাকতাম! আফসোস, আপনার কওম (মক্কাবাসী) যখন আপনাকে দেশ থেকে বের করে দেবে, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম!" নবীজি (সা.) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কি আমাকে বের করে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যা নিয়ে এসেছেন (নবুওয়াত), ইতিহাসে যখনই কোনো ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সারা দুনিয়া তার শত্রু হয়ে গেছে। যদি আমি আপনার সেই দিনগুলো পাই, তবে আপনাকে সর্বাত্মক সাহায্য করব।" এর কিছুদিন পরেই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন।

৪.৩ গোপনে ইসলামের দাওয়াত ও প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীগণ (The Secret Dawah and the First Converts)

নবুওয়াত লাভের পর প্রথম তিন বছর নবীজি (সা.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে গোপনে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন মক্কার কুরাইশরা শুরুতেই তীব্র আক্রমণাত্মক হয়ে না ওঠে। নবীজি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কেবল তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু, আত্মীয় এবং নির্ভরযোগ্য মানুষদের কাছে এক আল্লাহর তাওহীদের বাণী পৌঁছাতে থাকেন।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীগণ: নবীজির দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা হলেন:

১. নারীদের মধ্যে: হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)—তিনি সর্বসম্মতভাবে উম্মতের মধ্যে প্রথম মুসলমান।

২. পুরুষদের মধ্যে: হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)—নবীজির আজীবন সুহৃদ ও বন্ধু।

৩. বালকদের মধ্যে: হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)—যাঁর বয়স তখন ছিল মাত্র ১০ বছর এবং তিনি নবীজির ঘরেই লালিত-পালিত হচ্ছিলেন।

৪. দাসদের মধ্যে: হযরত যায়েদ ইবনে হারিসাহ (রা.)—নবীজির মুক্তিকৃত দাস ও পালিত পুত্র।

আবু বকর (রা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ: আবু বকর (রা.) মক্কায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে কুরাইশদের অনেক শ্রেষ্ঠ যুবকরা ইসলাম গ্রহণ করেন, যারা পরবর্তীতে ইসলামের স্তম্ভে পরিণত হন। তাঁদের মধ্যে হযরত উসমান ইবনে আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) অন্যতম।

দারুল আরকাম (প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র): গোপনে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা যখন প্রায় ৪০ জনে পৌঁছায়, তখন নবীজি (সা.) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত 'আরকাম ইবনে আবিল আরকাম'-এর বাড়িটিকে ইসলামের গোপন কেন্দ্র ও প্রথম শিক্ষালয় হিসেবে বেছে নেন। সেখানে মুসলমানরা গোপনে জামায়াতে সালাত আদায় করতেন এবং নবীজির কাছ থেকে ওহীর শিক্ষা নিতেন।

৪.৪ সাফা পাহাড়ে প্রকাশ্য দাওয়াত ও কুরাইশদের বিরোধিতা (Public Dawah at Mount Safa and Oppositions)

গোপনে দাওয়াতের তিন বছর পর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়: "অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।" (সূরা আল-হিজর: ৯৪)। এই নির্দেশ পাওয়ার পর নবীজি (সা.) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সাফা পাহাড়ে সমবেতকরণ: তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী, কোনো বড় বিপদের আশঙ্কা থাকলে মানুষ পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে গোত্রের লোকদের ডাকত। নবীজি (সা.) একদিন সকালে সাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, "ইয়া সাবাহাহ!" (হে সকালের বিপদ!)। তাঁর ডাক শুনে কুরাইশদের বনু হাশেম, বনু উমাইয়াহ, বনু মাখযূমসহ সমস্ত গোত্রের মানুষ সাফা পাহাড়ের নিচে এসে সমবেত হলো। যারা আসতে পারেনি, তারা প্রতিনিধি পাঠাল।

আল-আমীনের সত্যতার স্বীকৃতি: নবীজি (সা.) সমবেত মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে কুরাইশরা! আমি যদি আপনাদের বলি যে, এই পাহাড়ের অপর প্রান্তে এক বিশাল

শত্রুবাহিনী আপনাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ওত পেতে বসে আছে, আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন?" তারা সবাই একবাক্যে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। কারণ আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি, আপনি আমাদের কাছে 'আল-আমীন' (পরম বিশ্বস্ত)।"

তাওহীদের ডাক ও আবু লাহাবের ধৃষ্টতা: মক্কাবাসীদের কাছ থেকে নিজের সত্যবাদিতার স্বীকৃতি নেওয়ার পর নবীজি (সা.) মূল ঘোষণাটি দিলেন। তিনি বললেন: "তাহলে আমি আপনাদের সতর্ক করছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন আযাব আপনাদের সামনে আসছে। আপনারা বলুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তবেই আপনারা সফল হতে পারবেন।"

"তাহলে আমি আপনাদের সতর্ক করছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন আযাব আপনাদের সামনে আসছে। আপনারা বলুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তবেই আপনারা সফল হতে পারবেন।"

এই কথা শোনার সাথে সাথে মক্কার কাফেররা স্তব্ধ হয়ে গেল। নবীজির আপন চাচা আবু লাহাব চরম ক্ষিপ্ত হয়ে হাত নেড়ে ধৃষ্টতার সাথে বলে উঠল, "তাব্বান লাকা সাইরাল ইয়াওম, আলী হাযা জামা'তানা?" (তোমার হাত ধ্বংস হোক আজকের দিনে! এই সামান্য কথার জন্যই কি তুমি আমাদের এখানে জমা করেছ?)। আবু লাহাবের এই চরম বেয়াদবি ও কুফরের জবাবে আল্লাহ তাআলা সরাসরি পবিত্র কুরআনের পুরো একটি সূরা নাযিল করেন: "ধবংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও..." (সূরা লাহাব)।

কুরাইশদের বিরোধিতার সূচনা: সাফা পাহাড়ের এই ঘটনার পর থেকেই মক্কায় ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের প্রকাশ্য শত্রুতা, উপহাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতার কালো অধ্যায় শুরু হয়, যা পরবর্তীতে মুসলমানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের রূপ নেয়।

অধ্যায় ৫: মক্কী জীবনের নির্যাতন, হিজরত ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

৫.১ সাহাবাদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতন (Persecution of Muslims by Quraish)

সাফা পাহাড়ে প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মক্কার কুরাইশরা বুঝতে পারল যে ইসলাম তাদের পূর্বপুরুষদের মূর্তিপূজা এবং অন্যায় সমাজব্যবস্থার মূলে আঘাত করছে। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল, এতিম ও দাস-দাসীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে।

হযরত বিলাল (রা.)-এর ওপর নির্যাতন: উমাইয়াহ ইবনে খালাফের ক্রীতদাস হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলে উমাইয়াহ তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার দুষ্ট বালকদের হাতে তুলে দিত, যারা তাঁকে পাহাড়ের পাথুরে রাস্তায় টেনে-হিঁচড়ে বেড়াত। 'Ar-Raheeq Al-Makhtum'-er বর্ণনা অনুযায়ী, দুপুরের প্রচণ্ড রোদে মক্কার উত্তপ্ত বালুর ওপর তাঁকে খালি পিঠে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপর বিশাল ভারী পাথর চাপা দেওয়া হতো, যেন তিনি শ্বাস নিতে না পারেন। এত নির্যাতনের পরও বিলালের মুখ থেকে কেবল একটি শব্দই বের হতো— "আহাদ, আহাদ!" (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক!)। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) চড়া মূল্যে তাঁকে কিনে মুক্ত করে দেন।

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.)-এর নির্যাতন: কাফেররা তাঁকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর চিত করে শুইয়ে রাখত এবং এক নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাঁর বুকের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরত, যেন তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। তাঁর পিঠের চর্বি গলে কয়লা নিভে যাওয়া পর্যন্ত এই নির্যাতন চলত।

প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়াহ (রা.) ও আম্মার (রা.)-এর পরিবার: ইয়াসির (রা.), তাঁর স্ত্রী সুমাইয়াহ (রা.) এবং পুত্র আম্মার (রা.)—এই পুরো পরিবার বনু মাখযূম গোত্রের হাতে চরম নির্যাতিত হচ্ছিল। নবীজি (সা.) তাঁদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অশ্রুসজল চোখে বলতেন, "হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্য ধরো! তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।" একদিন আবু জাহেল চরম ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত সুমাইয়াহ (রা.)-এর লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। এর ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন এবং ইতিহাসে ইসলামের প্রথম শহীদ (Female Martyr) হওয়ার গৌরব লাভ করেন। কিছুকাল পর তাঁর স্বামী ইয়াসিরও নির্যাতনের কারণে মারা যান।

৫.২ হাবশায় (আবিসিনিয়া) প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরত (Migrations to Abyssinia)
মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা যখন সহীহ সীমার বাইরে চলে গেল, তখন নবীজি (সা.) সাহাবাদের দ্বীন ও জীবন রক্ষার জন্য মক্কা ছেড়ে আফ্রিকার 'হাবশা' (বর্তমান ইথিওপিয়া) দেশে হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। সেখানকার খ্রিষ্টান রাজা 'নাজ্জাশী' (Negus) ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, যাঁর রাজ্যে কেউ জুলুমের শিকার হতো না।
প্রথম হিজরত (নবুওয়াতের ৫ম বছর): নবীজির নির্দেশে খ্রিষ্টীয় ৬১৫ সালে ১২ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারীর একটি কাফেলা গোপনে মক্কা ছেড়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে হাবশায় হিজরত করেন। এই কাফেলায় হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) এবং নবীজির কন্যা রুকাইয়াহ (রা.) উপস্থিত ছিলেন। লূত (আ.)-এর পর উসমান (রা.)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সপরিবারে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেন।
দ্বিতীয় হিজরত ও জা'ফর (রা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ: পরবর্তীতে মক্কার পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারীর দ্বিতীয় একটি বড় কাফেলা হাবশায় গমন করে। কুরাইশরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আমর ইবনে আস-সহ দুজন প্রতিনিধি পাঠায় নাজ্জাশীর দরবারে, যেন মুসলমানদের ফেরত দেওয়া হয়। নাজ্জাশী মুসলমানদের ডেকে কুরাইশদের অভিযোগের সত্যতা জানতে চাইলেন।
সীরাত ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী, মুসলমানদের পক্ষে হযরত আলী (রা.)-এর বড় ভাই জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা.) এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ভাষণ দেন। তিনি জাহেলী যুগের অন্ধকার, ব্যভিচার ও কন্যা সন্তান হত্যার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁদের এক আল্লাহর ইবাদত, সত্য কথা বলা এবং আমানত রক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন। নাজ্জাশী যখন কুরআনের কোনো অংশ শুনতে চাইলেন, তখন জা'ফর (রা.) সূরা মারিয়ামের শুরুর আয়াতগুলো অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করেন। তা শুনে রাজা নাজ্জাশী এবং তাঁর দরবারের পাদ্রীরা এত কাঁদলেন যে তাঁদের দাড়ি ভিজে গেল। নাজ্জাশী কুরাইশদের উপহার ফেরত দিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! এই বাণী এবং মূসা (আ.)-এর বাণী একই উৎস থেকে এসেছে। আমি এদের কখনোই আপনাদের হাতে তুলে দেব না।"

হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) প্রথম হিজরত

নবুয়তের চতুর্থ বছর থেকে মক্কার কাফেরদের অত্যাচার শুরু হলেও পঞ্চম বছরে তা চরম আকার ধারণ করে। সাহাবিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা যখন মানুষের সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং দ্বীনের ওপর টিকে থাকা জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন:

"বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। যারা এই দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।" (সূরা যুমার, ৩৯:১০)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের নিরাপদ ভূমিতে পরিযায়নের (হিজরতের) ইঙ্গিত দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের বললেন, *"তোমরা আল্লাহর জমিনের কোথাও হিজরত করে চলে যাও। শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের একত্রিত করবেন।"* সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, *"আমরা কোথায় যাব?"* তখন রাসূল (সা.) আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) দিকে ইশারা করে বললেন, *"সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশা আছেন, যাঁর রাজ্যে কেউ কারও ওপর জুলুম করতে পারে না।"*

অবশেষে নবুয়তের ৫ম বছরের রজব মাসে ১৬ জন সাহাবির (১১ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী) একটি দল আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন।

হিজরতের রোমাঞ্চকর সফর

সাহাবিদের এই দলটি অত্যন্ত গোপনে কেউ বাহনে, আবার কেউ হেঁটে মক্কা থেকে রওনা হন। লোহিত সাগরের শুআইবা বন্দরে পৌঁছে তাঁরা ভাগ্যক্রমে আবিসিনিয়া যাওয়ার দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ পেয়ে যান। মাত্র ৫ দিরহাম ভাড়ার বিনিময়ে জাহাজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের তুলে নেয়। ওদিকে কুরাইশরা হিজরতের খবর পেয়ে সাহাবিদের ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছানোর আগেই জাহাজ ছেড়ে দেয়। ফলে সাহাবিগণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে যান। এই দফায় তাঁরা রজব থেকে শাওয়াল মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

হিজরতের ভূমি হিসেবে কেন আবিসিনিয়াকে বেছে নেওয়া হলো?

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক: আবিসিনিয়ার তৎকালীন সম্রাট 'নাজ্জাসি' (আসহামা) ছিলেন একজন পরম ন্যায়পরায়ণ বাদশা। তাঁর রাজ্যে কোনো অন্যায় সহ্য করা হতো না, ফলে শান্তিতে দ্বীন পালনের জন্য এটি ছিল সর্বোত্তম জায়গা।

২. **পূর্ব পরিচিতি:** কুরাইশদের সাথে আবিসিনিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে মক্কার মুসলমানদের কাছে আবিসিনিয়ার ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থা বেশ পরিচিত ছিল।

৩. **নিকটবর্তী দূরত্ব:** মক্কা থেকে আবিসিনিয়া তুলনামূলক কাছে ছিল। মক্কা থেকে শুআইবা বন্দর যেতে সময় লাগত দেড় দিন এবং সেখান থেকে জাহাজে আবিসিনিয়া পৌঁছাতে মাত্র ৫-৭ ঘণ্টা সময় লাগত। অর্থাৎ, মাত্র ২ দিনেই সেখানে পৌঁছানো সম্ভব ছিল।

৪. **আহলে কিতাব বা খ্রিষ্টান সমাজ:** আবিসিনিয়ার বাদশা ও জনগণ মক্কার কাফেরদের মতো মূর্তিপূজারী (মুশরিক) ছিলেন না, বরং খ্রিষ্টান তথা 'আহলে কিতাব' ছিলেন। ধর্মীয়ভাবে তাঁরা মুসলমানদের নিকটবর্তী ছিলেন। যেমনটি আল্লাহ সূরা আল-মায়েদার ৮২ নম্বর আয়াতে বলেছেন:

"...এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের বন্ধুত্বের অধিক নিকটবর্তী পাবেন তাদেরকে, যারা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম ও দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না।"

একটি ভুল বোঝাবুঝি ও প্রথম দফার মুহাজিরদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন

একই বছরের রমজান মাসে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কাবা ঘরের সামনে কুরাইশদের এক সমাবেশে সূরা নাজম তিলাওয়াত করছিলেন। কুরআনের ঐশ্বরিক বাচনভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে কাফেররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনছিল। সূরা নাজমের শেষ আয়াতে যখন পৌঁছালেন:

"অতএব আল্লাহকে সেজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো।" (সূরা নাজম, ৫৩:৬২)

আয়াতটি পাঠ করেই রাসূল (সা.) সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত হতবিহ্বল কাফেরেরাও (এবং ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে জিনেরাও) সেজদা করে বসল! কেবল ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা (মতান্তরে উমাইয়া ইবনে খালাফ) সেজদা না করে এক মুঠো মাটি কপালে লাগিয়ে বলল, "এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট।"

সেজদা থেকে ওঠার পর কাফেরদের হুঁশ ফিরল। তারা বুঝতে পারল যে সাধারণ মানুষ এখন তাদের উপহাস করবে। এই অপমান থেকে বাঁচতে তারা একটি প্রোপাগান্ডা ছড়ালো। তারা রটিয়ে দিল যে, মুহাম্মদ (সা.) নাকি তাদের দেব-দেবীর প্রশংসা করে

বলেছেন: *"এরা সব উচ্চ পর্যায়ের দেবী, তাদের শাফায়াত আশা করা যায়।"* (নাউজুবিল্লাহ)। এটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যাচার, যা তারা নিজেদের সেজদা করার লজ্জা ঢাকতে বানিয়েছিল।

ফলাফল: কুরাইশদের সেজদা করার এই খবরটি বিকৃত হয়ে আবিসিনিয়ার মুসলমানদের কানে পৌঁছায়। তাঁরা ভাবেন মক্কার কাফেররা বুঝি ইসলাম গ্রহণ করেছে! এই ভুল খবরে আশ্বস্ত হয়ে ৩৩ জন পুরুষ ও ৬ জন নারীসহ মোট ৩৯ জন সাহাবি মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি এসে তাঁরা জানতে পারেন যে খবরটি মিথ্যা ছিল। তখন এক কঠিন দোলাচলের মধ্যে কেউ গোপনে, আবার কেউ আত্মীয়দের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

মুহাজির সাহাবিরা মক্কায় ফেরার পর কুরাইশদের অত্যাচারের আগুন আরও দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। এবার তারা মুসলমানদের ওপর আগের চেয়েও নিষ্ঠুর নির্যাতন শুরু করল। নিরুপায় হয়ে রাসূল (সা.) সাহাবিদের আবারও আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরামর্শ দেন। এবার কুরাইশরা সতর্ক থাকলেও আল্লাহর রহমতে সাহাবিরা নিরাপদে চলে যেতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় দফায় ইবনে হিশামের বর্ণনা মতে ৮৬ জন পুরুষ এবং ১৬ জন (মতান্তরে ১৮/১৯ জন) নারী হিজরত করেন।

মুসলমানদের ফিরিয়ে আনতে কুরাইশদের চক্রান্ত ও জাফর (রা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

আবিসিনিয়ায় মুসলমানরা শান্তিতে আছেন শুনে কুরাইশরা ঈর্ষায় ফেটে পড়ল। তারা মুসলমানদের বন্দি করে ফিরিয়ে আনার জন্য **আমর ইবনুল আস** এবং **আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়াহ**-কে দামি দামি উপহারসহ দূত বানিয়ে নাজ্জাসির দরবারে পাঠাল। তারা নাজ্জাসির দরবারের পাদ্রিদের প্রচুর উপহার দিয়ে হাত করল এবং বাদশার সামনে গিয়ে বলল:

"হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের দেশের কিছু নির্বোধ যুবক ধর্মদ্রোহী হয়ে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে, আবার আপনার খ্রিষ্টধর্মও গ্রহণ করেনি; বরং নতুন এক ধর্ম আবিষ্কার করেছে। অনুগ্রহ করে ওদের আমাদের হাতে ফেরত দিন।"

পাদ্রিরাও কুরাইশদের পক্ষ নিয়ে বাদশাকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু দূরদর্শী সম্রাট নাজ্জাসি বললেন, *"উভয় পক্ষের কথা না শুনে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেব না।"* তিনি মুসলমানদের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

দরবারে মুসলমানদের মুখপাত্র হিসেবে হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) দাঁড়িয়ে এক ঐতিহাসিক, রুদ্ধশ্বাস ও হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিলেন:

"হে সম্রাট! আমরা ছিলাম এক জাহেলিয়াত ও অন্ধকারের জাতি। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম এবং প্রতিবেশীদের ওপর জুলুম করতাম। সবলরা দুর্বলদের সম্পদ গ্রাস করত। এমন সময় আল্লাহ আমাদের মাঝে আমাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠালেন, যাঁর বংশমর্যাদা, সততা ও আমানতদারী সম্পর্কে আমরা আগে থেকেই জানতাম। তিনি আমাদের এক আল্লাহর ইবাদত করার দাওয়াত দিলেন, মূর্তিপূজা ছাড়তে বললেন, সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং রক্তপাত ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাদের সালাত, জাকাত ও রোজার আদেশ দিলেন..."

বক্তব্য শেষে বাদশা নাজ্জাসি জানতে চাইলেন, *"তোমাদের নবীর ওপর নাজিল হওয়া কোনো বাণী কি তোমাদের মুখস্থ আছে?"* হযরত জাফর (রা.) অত্যন্ত শান্ত ও ভাবগম্ভীর কণ্ঠে **সূরা মারইয়ামের** শুরুর দিকের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনালেন।

ঐশ্বরিক বাণীর প্রভাব: কুরআনের তিলাওয়াত শুনে বাদশা নাজ্জাসি এত কাঁদলেন যে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল এবং দরবারের পাদ্রিদের কান্না পরিহিত কিতাবগুলো ভিজে একাকার হয়ে গেল। বাদশা আবেগপ্লুত হয়ে বললেন, *"নিশ্চয়ই এই বাণী এবং ঈসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ বাণী একই উৎস (আলো) থেকে এসেছে।"* তিনি কুরাইশ দূতদের উপহার সামগ্রী ফেরত দিয়ে বিদায় করে দিলেন এবং মুসলমানদের অভয় দিয়ে বললেন, *"তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো, কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।"*

মদিনায় প্রত্যাবর্তন ও নাজ্জাসির ইন্তেকাল

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের একটি বড় অংশ মদিনায় ফিরে আসেন (যাঁদের মধ্যে ২৪ জন বদর যুদ্ধে শরিক হন)। বাকিরা ৭ম হিজরিতে খায়বার বিজয়ের দিন জাফর (রা.)-এর সাথে মদিনায় পৌঁছান। জাফর (রা.) যখন বিদায় নেন, নাজ্জাসি নিজে তাঁদের সফরের খরচ দেন এবং রাসূল (সা.)-

এর জন্য উপহার পাঠান। তিনি জাফরের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর কাছে বার্তা পাঠান: *"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর কাছে আমার আবেদন, তিনি যেন আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।"*

জাফর (রা.) মদিনায় পৌঁছালে রাসূল (সা.) তাঁকে জড়িয়ে ধরে আবেগপ্লুত হয়ে বললেন, *"আমি জানি না আজ আমি খায়বার বিজয়ে বেশি খুশি হয়েছি, নাকি জাফরের প্রত্যাবর্তনে!"* এরপর নাজ্জাসির বার্তা শুনে রাসূল (সা.) সাথে সাথে অজু করে তিনবার দোয়া করলেন— *"হে আল্লাহ! তুমি নাজ্জাসিকে ক্ষমা করে দাও।"*

৯ম হিজরির রজব মাসে এই মহান সম্রাট নাজ্জাসি ইন্তেকাল করেন। মদিনায় বসে অলৌকিকভাবে রাসূল (সা.) তা জানতে পারেন এবং সাহাবিদের নিয়ে মদিনার জান্নাতুল বাকিতে তাঁর **গায়েবানা জানাজা** পড়ান। রাসূল (সা.) তাঁর পুরো জীবনে কেবল এই একবারই কারও গায়েবানা জানাজা পড়েছিলেন।

শায়বে আবি তালিবে বয়কট ও ইসলামের দুই বীরের আগমন

আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং মক্কায় **হযরত হামজা (রা.)** ও **হযরত উমর (রা.)**-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে কাফেররা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে ইসলামকে আর সহজে থামানো যাবে না। তাই তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল— মোহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে হবে।

কুরাইশরা বনু হাশিম গোত্রের কাছে দাবি করল যেন মুহাম্মদ (সা.)-কে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বনু হাশিম গোত্র (মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে) এই অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এর জবাবে কুরাইশদের সব গোত্র একত্রিত হয়ে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের চুক্তি করে। তবে রাসূলের আপন চাচা আবু লাহাব নিজের গোত্র ছেড়ে কাফেরদের সাথে হাত মেলায়।

৩ বছরের বন্দি জীবন ও নির্মম কষ্ট

নবুয়তের ৭ম বছরের মহররম মাসে এই বয়কট শুরু হয়। কাবা ঘরের ভেতরে চুক্তিনামাটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শর্ত ছিল— বনু হাশিম গোত্রের সাথে কেউ কোনো ব্যবসা করবে না, খাবার বিক্রি করবে না এবং বিয়ে-শাদী করবে না, যতক্ষণ না তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে হস্তগত করছে।

এই দুই গোত্রের নারী, পুরুষ ও শিশুরা 'শায়বে আবু তালিব' নামক গিরিপথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। কুরাইশরা চারপাশ পাহারা দিত যাতে কোনো খাবার ভেতরে না পৌঁছায়।

কষ্টের তীব্রতা কেমন ছিল তা বর্ণনা করে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, *"আমরা ক্ষুধার চোটে গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে ছিলাম।"*

বয়কটের অবসান ও উইপোকার অলৌকিক ঘটনা

দীর্ঘ ৩ বছর এই নির্মম বয়কট চলার পর মক্কার কিছু দয়াশীল ও বিবেকবান অমুসলিম নেতা (হিশাম ইবনে আমর, যুহাইর ইবনে আবি উমাইয়া, মুতঈম ইবনে আদি, আবুল বুখতারি এবং জামআ ইবনে আসওয়াদ) এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেন। হিশাম গোপনে পাহাড়ে উটের পিঠে খাবার বোঝাই করে গিরিপথের দিকে তাড়িয়ে দিতেন যেন অবরুদ্ধরা খাবার পায়।

পরদিন কাবা চত্বরে যুহাইর চিৎকার করে বললেন, *"হে মক্কাবাসী! আমরা ভালো ভালো খাবার খাব আর বনু হাশিম না খেয়ে মরবে, তা হতে পারে না। এই চুক্তি ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি শান্ত হব না।"* আবু জাহেল বাধা দিতে এলে অন্য চারজন নেতাও যুহাইরের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

ঠিক এই সময় আবু তালিব সেখানে এসে কুরাইশদের বললেন, *"আমার ভাতিজা (মুহাম্মদ) আমাকে জানিয়েছে যে তোমাদের সেই অন্যায় চুক্তিপত্রটি উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে, শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ, আপনার নামে) অংশটুকু ছাড়া। তোমরা গিয়ে পরীক্ষা করো। যদি তার কথা সত্যি হয় তবে বয়কট তুলে নাও, আর মিথ্যা হলে আমি তাকে তোমাদের হাতে সঁপে দেব।"*

মুতঈম ইবনে আদি চুক্তিপত্রটি আনতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেখা গেল, সত্যিই উইপোকা পুরো দলিলটি খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে, কেবল আল্লাহর নামটুকু অক্ষত আছে! এই অলৌকিক ঘটনা দেখে কাফেররা স্তব্ধ হয়ে গেল। যুহাইর ও মুতঈমের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুবকেরা গিরিপথে গিয়ে দীর্ঘ ৩ বছর পর বনু হাশিম গোত্রকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন। মুক্ত হয়ে আবু তালিব ও সাহাবিরা কাবার গিলাফ ধরে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অশ্রু সজল চোখে দোয়া করলেন।

এই দীর্ঘ ইতিহাস থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় দিকসমূহ:

১. সত্যের পথে অবিচলতা ও সাহস: সাহাবিরা বাদশা নাজ্জাসির দরবারে গিয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইসলামের আকিদাকে লুকিয়ে রাখেননি। তারা রাজদরবারেও সত্য প্রকাশে কোনো আপস বা ভয় পাননি।

২. সংস্কৃতির শুদ্ধিকরণ: অন্য দেশের সংস্কৃতির যা কিছু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, তা বর্জন করতে হবে। যেমন— আবিসিনিয়ার দরবারে রাজাকে সেজদা করার নিয়ম

থাকলেও সাহাবিরা নাজ্জাসিকে সেজদা করেননি। তারা পরিষ্কার বলেছেন, *"আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করি না।"* তবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন বিষয় গ্রহণে বাধা নেই।

৩. **নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকা:** মুসলমানরা যেখানেই থাকুক, সংখ্যায় যতই কম হোক না কেন, তাদের একজন আমীর বা নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আবিসিনিয়ায় সাহাবিরা হযরত জাফর (রা.)-এর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল ছিলেন।

৪. **অমুসলিমদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি:** সব অমুসলিম এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও অনেক দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ থাকেন (যেমন বাদশা নাজ্জাসি, মুতঈম ইবনে আদি বা হিশাম)। ইসলাম তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার শিক্ষা দেয়। বদর যুদ্ধের পর রাসূল (সা.) বলেছিলেন, *"আজ যদি মুতঈম ইবনে আদি জীবিত থাকত এবং এই বন্দিদের জন্য সুপারিশ করত, তবে আমি তার সম্মানে সবাইকে বিনা ফদিয়ায় ছেড়ে দিতাম।"*

৫. **আল্লাহর অদৃশ্য বাহিনী:** শায়বে আবু তালিবের বয়কট ভাঙার পেছনে একটি সাধারণ 'উইপোকা' যেভাবে ভূমিকা রেখেছিল, তা প্রমাণ করে পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর সৈনিক। যেমনটি সূরা মুদ্দাসসিরের ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: *"তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই ভালো জানেন।"*

৫.৩ হামযাহ ও উমার (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ (Conversion of Hamza and Umar)

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে মক্কার দুজন অত্যন্ত বীর, প্রভাবশালী ও সাহসী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং কুরাইশদের শিবিরে বড় আঘাত হানে।

হযরত হামযাহ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ: একদিন আবু জাহেল সাফা পাহাড়ের কাছে নবীজি (সা.)-কে পেয়ে চরম গালিগালাজ ও অপমান করে। নবীজি শান্তভাবে তা সহ্য করে বাড়ি ফিরে যান। আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের এক দাসী এই ঘটনাটি সচক্ষে দেখে। নবীজির আপন চাচা বীর হামযাহ শিকার থেকে ফিরলে দাসীটি তাঁকে ঘটনাটি জানায়। ভাতিজার প্রতি এই অপমান সহ্য করতে না পেরে হামযাহ সরাসরি কাবা প্রাঙ্গণে গিয়ে আবু জাহেলের মাথায় তাঁর ধনুক দিয়ে সজোরে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে

দেন এবং বীরদর্পে ঘোষণা করেন, "আমিও মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করলাম! ক্ষমতা থাকলে তোরা আমাকে বাধা দে।"

হযরত উমার (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ: উমার ইবনুল খাত্তাব ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রুদের একজন। তিনি নবীজিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তরবারি নিয়ে বের হয়েছিলেন। পথে নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে দেখা হলে তিনি জানতে পারেন যে, উমারের আপন বোন ফাত্বিমা এবং ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ ইতিমধ্যেই মুসলমান হয়ে গেছেন। উমার রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বোনের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের প্রহার করেন। কিন্তু বোনের দ্বীনের ওপর অটলতা দেখে তাঁর মন নরম হয়। তিনি টেবিলে রাখা সূরা ত্বাহা-র প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়তে শুরু করেন: "আমি আপনার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে আপনি কষ্টে পতিত হবেন..." (সূরা ত্বাহা: ১-২)।
কুরআনের অলৌকিক বাণীতে উমারের হৃদয় গলে যায়। তিনি তখনই তরবারি নিয়ে দারুল আরকামে গিয়ে নবীজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'Ar-Raheeq Al-Makhtum'-er বিবরণ অনুযায়ী, উমার (রা.) মুসলমান হওয়ার পর বললেন, "আমরা কেন গোপনে ইবাদত করব?" তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা প্রথমবার প্রকাশ্যে দুটি সারিতে বিভক্ত হয়ে (এক সারির নেতৃত্বে হামযাহ, অন্য সারিতে উমার) কাবার চত্বরে গিয়ে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করেন। সেদিন নবীজি উমারকে 'আল-ফারূক' (সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী) উপাধি দেন।
৫.৪ শিয়াবে আবু তালিবে বয়কট (The Boycott in the Valley of Abu Talib)
হামযাহ ও উমার (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং হাবশায় মুসলমানদের আশ্রয় লাভ দেখে কুরাইশরা বুঝতে পারল যে শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামকে থামানো যাচ্ছে না। তাই তারা বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রকে (যারা নবীজিকে রক্ষা করছিল) সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ একঘরে বা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়।
বয়কট চুক্তি ও শর্তাবলী: নবুওয়াতের ৭ম বছর মোহাররম মাসে কুরাইশরা একটি লিখিত চুক্তিপত্র তৈরি করে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়। চুক্তির মূল শর্ত ছিল:
১. বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের সাথে কেউ কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক করতে পারবে না।
২. তাদের কাছে কোনো প্রকার খাদ্য বা পণ্য বিক্রি করা যাবে না এবং তাদের থেকে কিছু কেনা যাবে না।

৩. মুহাম্মাদ (সা.)-কে হত্যার জন্য কুরাইশদের হাতে সঁপে না দেওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে।

তিন বছরের বন্দী জীবন: অনন্যোপায় হয়ে আবু তালিব তাঁর গোত্রের সমস্ত মানুষকে নিয়ে মক্কার একটি গিরিপথ 'শিয়াবে আবু তালিব'-এ আশ্রয় নেন (বনু হাশেমের মধ্যে কেবল আবু লাহাব কাফেরদের সাথে যোগ দেয়)। এই অবরুদ্ধ জীবন টানা তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। খাবারের অভাবে সাহাবীগণ ও শিশুরা গাছের পাতা ও শুকনো চামড়া পানিতে ভিজিয়ে চিবিয়ে খেতেন। শিশুদের ক্ষুধার্ত কান্নায় মক্কার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠত, কিন্তু কুরাইশদের মন গলত না।

অলৌকিক উপায়ে চুক্তির অবসান: নবুওয়াতের ১০ম বছরে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে নবীজিকে জানালেন যে, কাবার দেয়ালে ঝুলন্ত চুক্তিপত্রটি 'উঁই পোকা' খেয়ে ফেলেছে, কেবল আল্লাহর নাম (বিসমিকা আল্লাহুম্মা) টুকু বাকি আছে। আবু তালিব কাফেরদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমার ভাতিজা বলেছে তোমাদের চুক্তিপত্র উঁই পোকা খেয়ে ফেলেছে। যদি তার কথা সত্য হয় তবে তোমরা অবরোধ তুলে নাও, আর মিথ্যা হলে আমি তাকে তোমাদের হাতে দেব।" তারা কাবা ঘরে গিয়ে দেখল হুবহু তাই ঘটেছে। উঁই পোকা পুরো জুলুমের দলিলটি খেয়ে ফেলেছে। এই অলৌকিক ঘটনার পর এবং মক্কার কিছু বিবেকবান মানুষের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ তিন বছরের এই নিষ্ঠুর বয়কটের অবসান ঘটে।

৫.৫ আমুল হুযন বা দুঃখের বছর (The Year of Sorrow)

শিয়াবে আবু তালিবের দীর্ঘ তিন বছরের অনাহার ও কষ্টের কারাগার থেকে বের হওয়ার পরপরই নবীজি (সা.)-এর জীবনে দুটি বিশাল বিপর্যয় নেমে আসে, যা তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে ব্যথিত করে। ইতিহাসে এই বছরটিকে (নবুওয়াতের ১০ম বছর) "আমুল হুযন" বা দুঃখের বছর বলা হয়।

১. আবু তালিবের ইন্তেকাল: বয়কটের কষ্ট সহ্য করার কারণে বৃদ্ধ আবু তালিব অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শিয়াব থেকে বের হওয়ার কয়েক মাস পরেই ইন্তেকাল করেন। তিনি জীবিত থাকা পর্যন্ত কুরাইশরা নবীজির গায়ে হাত তোলার সাহস পায়নি। মৃত্যুর সময় নবীজি তাঁর কানের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, "চাচা! শুধু একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সুপারিশ করব।" কিন্তু আবু জাহেলের উস্কানিতে আবু তালিব পিতৃপুরুষের ধর্মের ওপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, যা নবীজিকে চরম ব্যথিত করে।

2. হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল: আবু তালিবের মৃত্যুর মাত্র তিন দিন (কারো মতে দুই মাস) পর নবীজি (সা.)-এর আজীবন সুখ-দুঃখের সাথী, ইসলামের প্রথম স্তম্ভ মা খাদিজাতুল কুবরা (রা.) ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি নিজের সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঘরের ভেতরে নবীজিকে সবচেয়ে বড় মানসিক সান্ত্বনা দিতেন।

একই বছরে বাইরের আশ্রয় (আবু তালিব) এবং ঘরের ভেতরের আশ্রয় (খাদিজা) হারিয়ে নবীজি (সা.) সম্পূর্ণ একাকী ও শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

হযরত সাওদা বিনতে জাম'আহ (রা.)-এর সাথে রাসূল (সা.)-এর বিবাহ

নবুয়তের ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত সাওদা বিনতে জাম'আহ (রা.)-কে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর **দ্বিতীয় স্ত্রী** (উম্মুল মুমিনীন)।

হযরত সাওদা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রাথমিক জীবনের ইসলাম: হযরত সাওদা (রা.) ইসলামের একদম শুরুর দিকে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হিজরতের কষ্ট: কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে তিনি তাঁর প্রথম স্বামী সাকরান বিন 'আমর (রা.)-এর সাথে আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় দফায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্বামী সাকরানও ছিলেন প্রথম সারির একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম।

বৈবাহিক জীবনের প্রেক্ষাপট: আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালেই (মতান্তরে হিজরত থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর) তাঁর স্বামী সাকরান বিন 'আমর ইন্তেকাল করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত সাওদা (রা.) সম্পূর্ণ একা ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন। তাঁর ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের মাধ্যমে একজন নিঃসঙ্গ ও হিজরতকারী নারী ইসলামের ছায়াতলে পরম আশ্রয় ও সম্মান লাভ করেন।

৫.৬ তায়েফ সফর ও রক্তক্ষয়ী নির্যাতন (The Journey to Taif)

তায়েফ সফর ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নির্মম নির্যাতন

মক্কার কুরাইশরা যখন ব্যাপকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা চরম করে তুলল, তখন রাসূল (সা.) এক বুক আশা নিয়ে নবুয়তের ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চল তায়েফে গমন করেন। তাঁর আশা ছিল, তায়েফের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হবে। এই সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)।

তায়েফবাসীদের রূঢ় আচরণ ও নির্যাতন

রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফে ১০ দিন অবস্থান করে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা অত্যন্ত অহংকারের সাথে সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে তায়েফ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এরপর তিনি সাধারণ মানুষের কাছে দ্বীনের কথা বলেন, কিন্তু তারাও তা অস্বীকার করে।

অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে রাসূল (সা.) মক্কায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু ফেরার পথে তায়েফের সর্দারেরা (অন্য বর্ণনা মতে, সাধারণ মানুষ যাতে ইসলামে আকৃষ্ট না হয় সেজন্য) শহরের দুষ্ট ছেলেপেলে, দাস ও বখাটে যুবকদের রাসূল (সা.)-এর পেছনে লেলিয়ে দেয়।

তারা রাস্তার দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তালি বাজিয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করতে থাকে এবং পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পাথরের নির্মম আঘাতে রাসূল (সা.)-এর পবিত্র জুতো মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে পায়ের সাথে আটকে যায়। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ও রক্তাক্ত হয়ে যখনই তিনি মাটিতে বসে পড়তেন, বখাটেরা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দিত এবং পুনরায় পাথর মারত।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে রাসূল (সা.)-কে রক্ষা করার চেষ্টা করেন, যার ফলে তাঁর মাথায় ও শরীরেও মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি হয়।

আঙুরের বাগানে আশ্রয় ও 'দুর্বলদের দোয়া'

অসহ্য কষ্ট ও ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ওতবা ইবনে রাবিয়াহ এবং শায়বা ইবনে রাবিয়াহ নামক মক্কার দুই ধনী কাফেরের একটি আঙুরের বাগানে আশ্রয় নেন। তিনি বাগানে প্রবেশ করার পর তায়েফের দুষ্ট লম্পটরা পিছু হটে চলে যায়।

রাসূল (সা.) বাগানের একটি আঙুর গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে বসেন। শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল, মন ছিল তায়েফবাসীদের ঈমান না আনার বেদনায় ভারাক্রান্ত। এই চরম মুহূর্তে তিনি হাত তুলে আল্লাহর দরবারে এক আকুল প্রার্থনা জানান, যা ইসলামের ইতিহাসে **'দুর্বলদের দোয়া' (دعاء المستضعفين)** নামে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি দোয়া করেন:

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার অসহায়তা এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতার অভিযোগ জানাচ্ছি। ওহে পরম দয়ালু! আপনি সকল দুর্বলদের প্রতিপালক, আপনি আমারও প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করছেন? এমন কোনো অচেনা মানুষের কাছে, যে আমার সাথে রূঢ় আচরণ করে? নাকি এমন কোনো শত্রুর হাতে, যাকে আপনি আমার সমস্ত বিষয়ের মালিক করে দিয়েছেন? যদি আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমার কোনো আফসোস নেই। আপনার ক্ষমার পরিধি আমার জন্য অনেক প্রশস্ত। আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা দ্বারা সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে চতুর্দিক আলোকময় হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত বিষয় যার ওপর ন্যস্ত। আপনার গযব ও অসন্তুষ্টি থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। আপনার সন্তুষ্টিই আমার একমাত্র কাম্য। আপনার শক্তি ব্যতীত আর কোনো শক্তি নেই।"

খ্রিষ্টান দাস 'আদ্দাস' ও অলৌকিক ঘটনা

দূর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই করুণ অবস্থা দেখে কাফের ওতবা ও শায়বার মনে কিছুটা দয়ার উদ্রেক হলো। তারা তাদের 'আদ্দাস' নামের এক খ্রিষ্টান দাসকে এক থোকা আঙুর দিয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে পাঠাল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আঙুর নেওয়ার সময় উচ্চস্বরে **"বিসমিল্লাহ"** (আল্লাহর নামে) বলে খাওয়া শুরু করলেন। আদ্দাস চমকে উঠে বলল, *"এই অঞ্চলের মানুষ তো কখনো এমন চমৎকার বাক্য বলে না!"*

রাসূল (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, *"তোমার বাড়ি কোথায় এবং তোমার ধর্ম কী?"*

সে বলল, *"আমি খ্রিষ্টান, আমার বাড়ি নিনেভা শহরে।"*

রাসূল (সা.) মুচকি হেসে বললেন, *"ওহ! তাহলে তুমি পুণ্যবান ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)-এর শহরের বাসিন্দা।"*

আদ্দাস অবাক হয়ে বলল, *"আপনি ইউনুসকে কীভাবে চেনেন?"*

রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, *"তিনি আমার ভাই। তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন, আর আমিও আল্লাহর নবী।"*

এই কথা শুনে আদ্দাস আবেগ ধরে রাখতে পারল না। সে পরম ভক্তিতে রাসূল (সা.)-এর ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং তাঁর কপাল, হাত ও পায়ে চুমু খেতে লাগল। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে ওতবা ও শায়বা আফসোস করে বলতে লাগল, *"দেখো দেখো, ওই লোকটা (মুহাম্মদ) আমাদের একমাত্র দাসটাকেও নিজের মন্ত্রে মুগ্ধ করে ফেলল!"* আদ্দাস ফিরে এলে তারা তাকে তিরস্কার করল। কিন্তু আদ্দাস দৃঢ় কণ্ঠে বলল, *"হে আমার মনিব! এই পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ আর কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন কথা বলেছেন যা একজন নবী ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না।"*

তায়েফের ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় দিকসমূহ:

১. **সুন্নাহভিত্তিক জীবনই সবচেয়ে বড় দাওয়াত:** দ্বীনের প্রচার শুধু বড় বড় মাহফিল বা বক্তৃতার মাধ্যমে হয় না। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, খাওয়ার শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলার মতো ছোট ছোট সুন্নাহ ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামের যে প্রায়োগিক রূপ প্রকাশ পায়, তা দেখে মানুষ সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয় (যেমনটি দাস আদ্দাস হয়েছিল)।

২. **মুসলিম পরিচয়ে গর্ববোধ করা:** যেকোনো পরিস্থিতিতে, সম্পূর্ণ নতুন বা প্রতিকূল পরিবেশেও নিজের মুসলিম পরিচয় প্রকাশে দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। রাসূল (সা.) সম্পূর্ণ অপরিচিত আদ্দাসের সামনেও অকপটে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন— *"আমি একজন নবী।"*

৩. **ফলাফলের চিন্তা না করে কাজ করে যাওয়া:** আমাদের দায়িত্ব হলো দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাওয়া, কে গ্রহণ করল আর কে করল না— সেই হিসাব আল্লাহর। রাসূল (সা.) যখন তায়েফে পাথর খাচ্ছিলেন, তখন সেখানে 'খালিদ আল উদওয়ান' নামের এক ছোট কাফের ছেলে উপস্থিত ছিল। সে বহুকাল পর বর্ণনা করে, *"আমি কাফের থাকা অবস্থায় তায়েফের মেলায় রাসূল (সা.)-কে সূরা তারিক তিলাওয়াত করতে শুনে তা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম এবং পরবর্তীতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।"* অর্থাৎ, তায়েফবাসীরা তাৎক্ষণিক ঈমান না আনলেও আল্লাহর পরিকল্পনা ভিন্ন ছিল।

৪. **দাঈ বা দ্বীনের প্রচারক কখনো হতাশ হন না:** তায়েফবাসীদের নির্মমতার পর আল্লাহ যখন পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়ে তায়েফ শহরকে দুটি পাহাড়ের মাঝে পিষে ধ্বংস করে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন দয়ার নবী তা নাকচ করে দিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করলেন, *"আজ এরা ঈমান না আনলেও এদের পরবর্তী প্রজন্ম এক আল্লাহর ইবাদত করবে।"* (পরবর্তীতে হুনায়নের যুদ্ধের পর পুরো তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল)।

৫. **দোয়ার আদব শিক্ষা:** দোয়ার শুরুতে নিজের অক্ষমতা, তুচ্ছতা ও অসহায়ত্ব আল্লাহর কাছে প্রকাশ করা তাওহীদের বহিঃপ্রকাশ এবং দোয়া কবুলের একটি বড় মাধ্যম। কোনো কঠিন বিপদেও আল্লাহর ফয়সালের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহ

তায়েফ সফরের পর, নবুয়তের ১১শ বছরের শাওয়াল মাসে মক্কায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহ (আকদ) সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স ছিল ৬ বছর। এরপর মদিনায় হিজরতের প্রথম বছর (মতান্তরে দ্বিতীয় বছর) শাওয়াল মাসে ৯ বছর বয়সে তিনি উম্মুল মুমিনীন হিসেবে স্বামীগৃহে (রাসূল সা.-এর ঘরে) পদার্পণ করেন।

অধ্যায় ৬: মি'রাজ, বায়'আত ও মদীনায় হিজরত

৬.১ ইসরা ও মি'রাজ: নৈশভ্রমণ ও ঊর্ধ্বগমন (Isra and Mi'raj: The Night Journey and Ascension)

তায়েফের কষ্টদায়ক ঘটনার পর এবং মক্কী জীবনের চরম হতাশার সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-কে এক অনন্য ও অলৌকিক উপহার দেন, যা ইতিহাসে 'ইসরা ও মি'রাজ' নামে পরিচিত। নবুওয়াতের একাদশ বা দ্বাদশ বছরে এক রাতে এই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল।

ইসরা (নৈশভ্রমণ): 'ইসরা' শব্দের অর্থ নৈশভ্রমণ। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইসরা-র প্রথম আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। এক রাতে জিবরাঈল (আ.) খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় 'বুরাক' নামক একটি অতিদ্রুতগামী বাহন নিয়ে নবীজি (সা.)-এর কাছে আসেন। নবীজি (সা.) বুরাকে চড়ে মুহূর্তের মধ্যে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকাদ্দাসে (মসজিদুল আকসা) পৌঁছান। সেখানে নবীজি (সা.) সমস্ত নবী-রাসূলদের ইমামতি করে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন, যার কারণে তিনি 'ইমামুল মুরসালীন' (নবীগণের নেতা) হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

মি'রাজ (ঊর্ধ্বগমন): বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে নবীজি (সা.)-এর ঊর্ধ্বাকাশ বা আরশে আজীমের সফরের নাম 'মি'রাজ'। জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে তিনি প্রথম আকাশ থেকে শুরু করে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। প্রতিটি আকাশে বিভিন্ন নবীর (যেমন- আদম, ঈসা, ইউসুফ, ইদরীস, হারুন, মূসা ও ইব্রাহীম আ.) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় হয়।

সিদরাতুল মুনতাহা ও সালাত ফরয হওয়া: সপ্তম আকাশের ওপর নবীজি (সা.) সৃষ্টির শেষ সীমানা 'সিদরাতুল মুনতাহা' (কুলবৃক্ষ) অতিক্রম করেন, যেখানে জিবরাঈল (আ.)-এর যাওয়ারও অনুমতি ছিল না। এরপর নবীজি (সা.) সরাসরি আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করেন এবং কোনো মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেন। 'Ar-Raheeq Al-Makhtum'-er বিবরণ অনুযায়ী, এই মি'রাজের রাত্রেই উম্মতের জন্য প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়, যা পরবর্তীতে হযরত মূসা (আ.)-এর পরামর্শে নবীজি কয়েকবার আল্লাহর কাছে আবেদন করার পর কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করা

হয়। তবে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেন যে, কেউ ৫ ওয়াক্ত আদায় করলে ৫০ ওয়াক্তেরই সওয়াব পাবে।

মক্কাবাসীদের অবিশ্বাস ও আবু বকর (রা.)-এর উপাধি লাভ: পরদিন সকালে নবীজি (সা.) কাবার চত্বরে এই ঘটনা বর্ণনা করলে কুরাইশরা হেসেই উড়িয়ে দেয় এবং উপহাস শুরু করে। তারা বিশ্বাসী আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলল, "তোমার বন্ধু বলছে সে নাকি এক রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ঘুরে আকাশে চলে গেছে!" আবু বকর (রা.) দৃঢ়তার সাথে বললেন, "তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন, তবে তা একবিন্দুও মিথ্যা নয়, আমি তা শতভাগ বিশ্বাস করি।" সীরাত ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী, কোনো প্রকার প্রমাণ ছাড়াই নবীজির মি'রাজের কথা বিশ্বাস করার কারণে সেদিন নবীজি (সা.) তাঁকে 'সিদ্দিক' (মহা সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করেন।

৬.২ আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়'আত (The Pledges of Aqabah)

মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচারের কারণে নবীজি (সা.) হজ্জের মরসুমে মক্কার বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন গোত্রের তাঁবুতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। খ্রিষ্টীয় ৬২০ সালে হজ্জের সময় ইয়াছরিব (মদীনা) থেকে আসা 'খাযরাজ' গোত্রের ৬ জন যুবক নবীজির দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা মদীনায় ফিরে ইসলামের প্রচার শুরু করেন।

আকাবার প্রথম বায়'আত (নবুওয়াতের ১২তম বছর): পরের বছর (খ্রিষ্টীয় ৬২১) মদীনা থেকে ১২ জন মুসলমান মক্কার নিকটবর্তী 'আকাবা' নামক গিরিপথে নবীজি (সা.)-এর সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর হাতে আনুগত্যের শপথ নেন। একে 'আকাবার প্রথম বায়'আত' বলা হয়। এর প্রধান শর্তগুলো ছিল— আল্লাহর সাথে শিরক না করা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, সন্তান হত্যা না করা এবং রাসূলের অবাধ্য না হওয়া। এই বায়'আতের পর নবীজি মদীনার মানুষকে কুরআন ও ইসলাম শেখানোর জন্য হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)-কে প্রথম মুবাল্লিগ (ইসলামী দূত) হিসেবে মদীনায় পাঠান। মুসআবের আন্তরিক দাওয়াতে মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে যায়।

আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত (নবুওয়াতের ১৩তম বছর): খ্রিষ্টীয় ৬২২ সালে হজ্জের মরসুমে মুসআব (রা.)-এর সাথে মদীনার ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী (নাসীবাহ বিনতে কা'ব ও আসমা বিনতে আমর) মক্কায় আসেন। তাঁরা মধ্যরাতে আকাবার

গিরিপথে অত্যন্ত গোপনে নবীজি (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠকে নবীজির আপন চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (যিনি তখনও মুসলমান হননি, কিন্তু ভাতিজার নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন) উপস্থিত ছিলেন। মদীনার লোকেরা নবীজিকে মদীনায় আসার আমন্ত্রণ জানান এবং অঙ্গীকার করেন যে, তাঁরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানকে যেভাবে রক্ষা করেন, ঠিক সেভাবেই নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে নবীজি ও ইসলামকে রক্ষা করবেন। এটিই ছিল 'আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত' বা যুদ্ধের বায়'আত (Bay'at al-Harb)। এই চুক্তির মাধ্যমেই মদীনায় হিজরতের ও ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

৬.৩ মদীনায় ঐতিহাসিক হিজরত (The Hijrah to Madinah)

আকাবার চুক্তির পর নবীজি (সা.) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। মুসলমানরা গোপনে দলে দলে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে লাগলেন। মক্কায় কেবল নবীজি (সা.), আবু বকর (রা.), আলী (রা.) এবং কিছু অসহায় ও অসুস্থ মুসলমান বাকি রইলেন।

দারুন নদওয়ায় কুরাইশদের ষড়যন্ত্র: মক্কা মুসলমান শূন্য হয়ে পড়ছে এবং মদীনায় মুসলমানদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে দেখে কুরাইশরা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তারা 'দারুন নদওয়া' (কুরাইশদের সংসদ ভবন)-তে এক জরুরি বৈঠকে বসল। সেখানে ইবলীস শয়তান এক বৃদ্ধ নজদীয় লোকের বেশে উপস্থিত হয়ে কুপ্ররোচনা দিল। অবশেষে আবু জাহেলের প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত হলো যে, মক্কার প্রতিটি প্রধান গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী যুবক তরবারি নিয়ে একসাথে মুহাম্মাদ (সা.)-কে আঘাত করে হত্যা করবে। এতে হত্যার রক্তপণের দায় সব গোত্রের ওপর পড়বে এবং বনু হাশেম গোত্র একা পুরো আরবের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না।

হিজরতের ওহী ও আলী (রা.)-কে বিছানায় রাখা: আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে কাফেরদের এই ষড়যন্ত্রের কথা নবীজিকে জানিয়ে দিলেন এবং সেই রাতেই মক্কা ছেড়ে হিজরতের অনুমতি দিলেন। নবীজি (সা.) দুপুরে তীব্র রোদের মাঝে আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতে গিয়ে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে বললেন। আবু বকর (রা.) আগে থেকেই দুটি উট প্রস্তুত রেখেছিলেন।

সীরাত ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী, রাতের বেলা কাফের যুবকরা যখন নবীজির বাড়ি ঘেরাও করে তরবারি হাতে অপেক্ষা করছিল, তখন নবীজি (সা.) হযরত আলী

(রা.)-কে বললেন, "তুমি আমার এই সবুজ চাদরটি মুড়ি দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। কাফেররা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সকাল হলে মক্কার লোকেদের গচ্ছিত আমানতগুলো তাদের বুঝিয়ে দিয়ে তুমি মদীনায় চলে এসো।" নিজের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমানতদারীর এই অনন্য দৃষ্টান্ত কেবল বিশ্বনবীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

কাফেরদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রস্থান: রাতের এক প্রহরে নবীজি (সা.) ঘর থেকে বের হলেন। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের দৃষ্টির ওপর এক আবরণ ফেলে দিলেন, যার ফলে তারা নবীজিকে দেখতে পেল না। নবীজি পবিত্র কুরআনের সূরা ইয়াছিনের ৯ নম্বর আয়াত ("আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি...") তিলাওয়াত করে কাফেরদের মাথার ওপর এক মুঠো ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে গেলেন।

৬.৪ সাওর গুহায় অবস্থান (The Stay at Cave Thawr)

মক্কা থেকে বের হয়ে কাফেরদের বিভ্রান্ত করার জন্য নবীজি সরাসরি উত্তর দিকে মদীনার পথে না গিয়ে, দক্ষিণ দিকে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত 'সাওর পাহাড়ের গুহায়' গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁরা তিন দিন ও তিন রাত কাটান।

গোপন তথ্য ও খাদ্য সরবরাহ: এই তিন দিন আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ দিনের বেলা মক্কার কুরাইশদের গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করে রাতে গুহায় এসে নবীজিকে জানাতেন। আবু বকরের কন্যা হযরত আসমা (রা.) অতি গোপনে পিঠে করে খাবার পৌঁছে দিতেন (এজন্য তাঁকে 'যাতুন নিতাকাইন' বা দুই কোমরবন্ধের অধিকারী বলা হয়)। আর আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা গুহার আশেপাশে ছাগল চড়িয়ে পায়ের চিহ্ন মুছে দিতেন এবং নবীজিকে ছাগলের তাজা দুধ খাওয়াতেন।

গুহার মুখে কাফেরদের আগমন ও আল্লাহর সাহায্য: কাফেররা সকালবেলা আলী (রা.)-কে বিছানায় দেখে বুঝতে পারল যে মুহাম্মাদ (সা.) চলে গেছেন। তারা চড়া পুরস্কার (১০০ উট) ঘোষণা করে চারদিকে চতুর খোজাড়ু ও খুনিদের লেলিয়ে দিল। খুঁজতে খুঁজতে কাফেরদের একটি দল একদম সাওর গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। তারা এতটাই কাছে ছিল যে একটু নিচু হয়ে পায়ের দিকে তাকালেই নবীজিদের দেখে ফেলত। আবু বকর (রা.) ভয়ে ও উদ্বেগে কেঁদে ফেলে ফিসফিস করে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তবেই আমাদের দেখে ফেলবে।" নবীজি

(সা.) অত্যন্ত শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, যা পবিত্র কুরআনে (সূরা তাওবাহ: ৪০) চিরদিনের জন্য অমর হয়ে আছে:

"লা তাহযান, ইন্নাল্লাহা মা'আনা" (ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন)।

নবীজি আরও বললেন, "হে আবু বকর! সেই দুজনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ?"

"লা তাহযান, ইন্নাল্লাহা মা'আনা" (ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন)।

নবীজি আরও বললেন, "হে আবু বকর! সেই দুজনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ?"

আল্লাহর অলৌকিক কুদরতে কাফেররা গুহার মুখে মাকড়সার জাল এবং কবুতরের বাসা দেখে ভাবল এখানে কেউ থাকলে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যেত। তারা গুহার ভেতর না তাকিয়েই ফিরে গেল।

সুরাকা ইবনে মালিকের ঘটনা: তিন দিন পর কাফেরদের উত্তেজনা কিছুটা কমলে তাঁরা আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত নামক এক নির্ভরযোগ্য অমুসলিম পথপ্রদর্শকের সাহায্যে লোহিত সাগরের উপকূলীয় অপ্রচলিত পথ ধরে মদীনার দিকে রওনা হলেন। পথে সুরাকা ইবনে মালিক নামক এক ঘোড়সওয়ার পুরস্কারের লোভে নবীজিকে চিনে ফেলে তরবারি নিয়ে আক্রমণ করতে ধেয়ে আসে। কিন্তু সে যতবারই কাছে আসার চেষ্টা করছিল, আল্লাহর কুদরতে তার ঘোড়ার পা বালির ভেতর দেবে যাচ্ছিল। সুরাকা বুঝতে পারল যে এক অদৃশ্য শক্তি নবীজিকে রক্ষা করছে। সে ক্ষমা চাইল এবং নবীজি তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "সুরাকা, সেদিন কেমন হবে যেদিন তুমি পারস্যের সম্রাট কিসরার স্বর্ণের কঙ্কণ (চুড়ি) পরবে?" (উমরের যুগে পারস্য বিজয়ের পর সুরাকাকে সেই চুড়ি পরানো হয়েছিল)। সুরাকা মক্কায় ফিরে গিয়ে অন্য কাফেরদের ভুল পথে চালিত করে নবীজিকে নিরাপদে যাওয়ার সুযোগ করে দিল।

অধ্যায় ৭: মাদানী জীবন: ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রধান যুদ্ধসমূহ

৭.১ কুবা মসজিদে আগমন ও মদীনায় প্রবেশ (Arrival at Quba and Entry into Madinah)

সাওর গুহা থেকে বের হয়ে দীর্ঘ সফরের পর নবীজি (সা.) ও আবু বকর (রা.) মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত 'কুবা' নামক স্থানে পৌঁছান।
কুবা মসজিদ নির্মাণ: কুবাতে নবীজি (সা.) ১৪ দিন (কারো মতে কয়েক দিন) অবস্থান করেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি ইসলামের ইতিহাসের প্রথম আনুষ্ঠানিক মসজিদ 'মসজিদে কুবা' প্রতিষ্ঠা করেন। নবীজি নিজে সাধারণ শ্রমিকের মতো পাথর ও মাটি বহন করে এই মসজিদ নির্মাণে অংশ নেন।

মদীনায় ঐতিহাসিক প্রবেশ: কুবা থেকে বিদায় নিয়ে নবীজি (সা.) যখন মদীনার মূল শহরে প্রবেশ করেন, তখন মদীনার আনসারদের (সাহায্যকারী) আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। ছোট ছোট মেয়েরা দফ বাজিয়ে গেয়ে উঠেছিল— "ত্বলা'আল বাদরু আলাইনা, মিন ছানিয়্যাতিল ওয়াদা'..." (আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে ওয়াদা উপত্যকা থেকে)। প্রতিটি গোত্রের মানুষই নবীজির উটের লাগাম ধরে অনুরোধ করছিলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের এখানে অবস্থান করুন।" নবীজি (সা.) বিচক্ষণতার সাথে বললেন, "তোমরা উটটিকে ছেড়ে দাও, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।" উটটি চলতে চলতে যেখানে গিয়ে বসল, সেটি ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের দুই এতিম শিশুর (সাহল ও সুহাইল) একটি জায়গা। নবীজি সেই জায়গার পাশেই অবস্থিত হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়িতে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেন।
৭.২ মসজিদে নববী নির্মাণ এবং আনসার-মুহাজির ভ্রাতৃত্ব (Building Masjid Nabawi and Brotherhood)
মদীনায় থিতু হওয়ার পর নবীজি (সা.) একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বুনিয়াদী কাজগুলো শুরু করেন।
মসজিদে নববী নির্মাণ: নবীজি (সা.) সেই এতিম দুই শিশুর জমির মূল্য পরিশোধ করে সেখানে 'মসজিদে নববী' নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এর দেয়াল ছিল মাটির ইট দিয়ে এবং ছাদ ছিল খেজুর পাতা ও ডালপালা দিয়ে তৈরি। এই মসজিদটি কেবল সালাতের

স্থান ছিল না; এটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সংসদ ভবন, বিচারালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র। মসজিদের একপাশে 'সুফফাহ' নামক একটি বারান্দা তৈরি করা হয়, যা ছিল ইসলামের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়।

মুয়াখাত বা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন: মক্কা থেকে আসা মুহাজিররা (হিজরতকারী) নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ মক্কাতেই ফেলে এসেছিলেন। তাঁদের অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে পুনর্বাসিত করার জন্য নবীজি (সা.) এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নেন, যা ইতিহাসে 'মুয়াখাত' নামে পরিচিত। তিনি একজন মুহাজির সাহাবীর সাথে একজন আনসার সাহাবীকে ভাই ভাই বানিয়ে দেন। সীরাত ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী, মদীনার আনসাররা এই ভ্রাতৃত্বের এমন অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের জমি, ঘরবাড়ি এবং সম্পদের অর্ধেক মুহাজির ভাইদের নাম লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুহাজিররা সগৌরবে তা প্রত্যাখ্যান করে শুধু ব্যবসার পথ বা বাজারের ঠিকানা জেনে নিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন।

৭.৩ মদীনা সনদ: পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান (The Constitution of Madinah)

মদীনায় মুসলমানদের পাশাপাশি ইহুদিদের তিনটি প্রধান গোত্র (বনু কাইনুকা, বনু নাযীর ও বনু কুরাইযা) এবং অনেক পৌত্তলিক বা মুশরিক বাস করত। এই বহুসাংস্কৃতিক ও বহুধর্মীয় সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নবীজি (সা.) একটি ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র তৈরি করেন, যা ইতিহাসে "মদীনা সনদ" নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম লিখিত আন্তর্জাতিক সংবিধান।

প্রধান ধারাসমূহ: 'Ar-Raheeq Al-Makhtum'-er বিশদ বিবরণ অনুযায়ী, এই সনদের মূল ধারাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. মদীনার মুসলমান, ইহুদি এবং অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় মিলে একটি সম্মিলিত জাতি (উম্মাহ) গঠন করবে।

২. প্রতিটি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে; কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

৩. বাইরে থেকে কোনো শত্রু মদীনা আক্রমণ করলে সব সম্প্রদায় মিলে যৌথভাবে মদীনাকে রক্ষা করবে।

৪. মদীনা শহরকে একটি 'পবিত্র ও নিরাপদ' স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হলো, যেখানে কোনো রক্তপাত বা যুদ্ধ করা যাবে না।
৫. স্বাক্ষরকারী গোত্রগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ বা বিবাদ তৈরি হলে, তার চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

৭.৪ বদরের যুদ্ধ: প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ (The Battle of Badr - 2 A.H.)
মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে দেখে মক্কার কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা করতে থাকে। হিজরতের দ্বিতীয় বছর (২ হিজরী) ১৭ই রমাযান ইসলামের ইতিহাসের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ 'বদরের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়।
যুদ্ধের কারণ: কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের একটি বিশাল বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে ফিরছিল। এই কাফেলার অর্থ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল কাফেরদের। নবীজি (সা.) এই কাফেলাটি আটকানোর জন্য সাহাবাদের নিয়ে বের হন। কিন্তু আবু সুফিয়ান পথ পরিবর্তন করে বেঁচে যায় এবং মক্কায় খবর পাঠায়। আবু জাহেল এই অজুহাতে মুসলমানদের চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ১০০০ সুসজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে ধেয়ে আসে।
সৈন্যসংখ্যা ও মুখোমুখি অবস্থান: মদীনা থেকে মাত্র ৮০ মাইল দূরে 'বদর' নামক প্রান্তরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। কাফেরদের ১০০০ সৈন্যের বিপরীতে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। মুসলমানদের কাছে ছিল মাত্র ২টি ঘোড়া এবং ৭০টি উট। অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও মুসলমানরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল।
নবীজির দুআ ও আল্লাহর সাহায্য: যুদ্ধের আগের রাতে নবীজি (সা.) একটি তাঁবুতে সেজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে দুআ করেছিলেন— "হে আল্লাহ! আজ যদি এই ছোট্ট দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে কেয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মতো কেউ বাকি থাকবে না।"

যুদ্ধের ফলাফল ও আবু জাহেলের মৃত্যু: পরদিন যুদ্ধ শুরু হলে আল্লাহর অলৌকিক সাহায্য নেমে আসে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্যার্থে আকাশ থেকে হাজার ফেরেশতা পাঠান (যার উল্লেখ সূরা আনফালে আছে)। মুসলমানদের তীব্র আক্রমণে কাফের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ইসলামের চরম শত্রু আবু জাহেল দুই আনসার

তরুণ (মুআউয়ায ও মুআয)-এর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তার মাথা কেটে নেন। যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মাত্র ১৪ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এই বিজয় ইসলামের ভিত্তি আরবে চিরতরে মজবুত করে দেয়।

বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী এবং ইসলামের আইনি বিধান

১. বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুরা (পরামর্শ সভা)

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে কাফেরদের চরম পরাজয়ের পর কুরাইশদের ৭০ জন সৈন্য মুসলমানদের হাতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ে। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম যুদ্ধবন্দীদের ঘটনা, তাই তাদের ব্যাপারে তখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো ওহী নাজিল হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বন্দী কুরাইশদের সাথে কী আচরণ করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে একটি 'শুরা' বা পরামর্শ সভা ডাকলেন। তিনি সাহাবীদের বললেন, "তোমরা তোমাদের মতামত দাও।"

সভায় সাহাবীগণ বিভিন্ন ধরনের মতামত দিতে লাগলেন। সবার কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য কিছুটা সময় নিলেন। সাহাবীদের আলোচনা থেকে মূলত দুটি প্রধান মতামত বা ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—একটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত এবং অন্যটি হযরত উমর (রা.)-এর মত।

২. দুই মহান সাহাবীর চরিত্র ও নবীগণের সাথে তুলনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই প্রধান সাহাবীর দূরদর্শিতা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো সবার সামনে তুলে ধরে অত্যন্ত সুন্দর একটি তুলনা করলেন:

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত ও তুলনা:
হযরত আবু বকর (রা.) বন্দীদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের পক্ষ নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরা সবাই আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন বা গোত্রের লোক। তাই এদের কাছ

থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। এতে মুসলমানদের অর্থনৈতিক শক্তিও বাড়বে এবং হয়তো পরবর্তীতে এরা ইসলামও গ্রহণ করতে পারে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই দয়ার্দ্র মনোভাব দেখে বললেন: "আবু বকরের উদাহরণ হলো নবী ইব্রাহীম (আ.)-এর মতো।" হযরত ইব্রাহীম (আ.) যেমন তাঁর গোত্রের অবাধ্যতার পরও আল্লাহর কাছে তাদের জন্য অনুকম্পা ও ক্ষমার আশা রাখতেন, আবু বকরও তেমনি উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

হযরত উমর (রা.)-এর মত ও তুলনা:
হযরত উমর (রা.) সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং কঠোর মত দিলেন। তিনি কুফর ও শিরকের মূল উৎপাটন করার পক্ষে ছিলেন। তিনি বললেন, এরা কুরাইশদের প্রধান নেতা ও ইসলামের কট্টর শত্রু। এদের কোনো দয়া না দেখিয়ে প্রত্যেকের নিকটাত্মীয় সাহাবীর হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং তরবারি দিয়ে এদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক, যাতে কাফেররা বুঝতে পারে মুসলমানদের অন্তরে কুফরের প্রতি কোনো আপস নেই।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই কঠোর ও আপসহীন মনোভাব দেখে বললেন: "উমরের উদাহরণ হলো নবী নূহ (আ.) এবং নবী মূসা (আ.)-এর মতো।" তাঁরা যেমন আল্লাহর শত্রুদের ধ্বংসের জন্য এবং কুফরকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কঠোর প্রার্থনা করেছিলেন, উমরও তেমনি সত্য ও মিথ্যার মাঝে কঠোর প্রাচীর তুলে ধরতে চান।

(পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর রা.-এর মতটি গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়, যার মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল তাদের মুক্তিপণ ছিল ১০ জন মুসলিম শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দান করা)।

৩. যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইসলামের আইনি বিধান

বদর যুদ্ধের এই ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পরবর্তীতে ইসলামের ফিকহী বা আইনি মূলনীতি অনুযায়ী, যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য এবং তাদের সাথে কী আচরণ করা হবে, তা সম্পূর্ণভাবে মুসলিম আমীর বা ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিবেচনা করে ইমাম নিচে বর্ণিত ৪টি ব্যবস্থার যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন:

১. মৃত্যুদণ্ড প্রদান: যদি কোনো বন্দী ইসলামের জন্য চরম বিপজ্জনক, যুদ্ধাপরাধী বা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তবে ইমাম তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন।

২. বিনা শর্তে মুক্তিদান: ইমাম যদি মনে করেন বন্দী ইসলামের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং তাকে ছেড়ে দিলে মুসলিমদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, তবে কোনো প্রকার মুক্তিপণ বা শর্ত ছাড়াই তাকে সরাসরি মুক্তি দিতে পারেন।

৩. মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিপণ (অর্থ বা বন্দী বিনিময়): আর্থিক মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অথবা শত্রুশিবিরে থাকা কোনো মুসলিম বন্দীর বিনিময়ে এই যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করা যেতে পারে।

৪. দাস হিসেবে রাখা: তৎকালীন আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি ও পরিস্থিতির আলোকে ইমাম চাইলে যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবেও রাখতে পারতেন (তবে ইসলামে দাসদের সাথেও অত্যন্ত মানবিক আচরণের কঠোর নির্দেশ রয়েছে)।

৭.৫ ওহুদের যুদ্ধ: একটি কঠিন পরীক্ষা (The Battle of Uhud - 3 A.H.)

উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও কারণ

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল উহুদ যুদ্ধের মূল চালিকাশক্তি। বদরের পরাজয়ের এক বছরের মাথায় কুরাইশরা মুসলিমদের ওপর পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়। এর পেছনে মূল কারণগুলো ছিল:

সামাজিক কারণ (Status Quo): আরবে কুরাইশদের যে একক নেতৃত্ব ও সামাজিক মর্যাদা ছিল, বদর যুদ্ধের পরাজয়ে তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। সেই হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধার করা তাদের জন্য মর্যাদার লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অর্থনৈতিক কারণ: মুসলিমদের কারণে মক্কার কুরাইশদের সিরিয়া অভিমুখী প্রধান বাণিজ্য পথটি অবরুদ্ধ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মদিনার শক্তিকে দমন করা তাদের জন্য জরুরি ছিল।

রাজনৈতিক কারণ ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হত্যার প্রতিশোধ: বদর যুদ্ধে নিহত আবু জাহেল, উতবা, শায়বাদের মতো শীর্ষ নেতাদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া এবং মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য।

কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও মদিনা যাত্রা

উহুদ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কুরাইশরা প্রায় ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে ৩,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে।

নারী বাহিনী: কুরাইশরা এই যুদ্ধে ১৫ জন (মতান্তরে ২৪ জন) নারীকে সাথে নেয়, যেন তাদের সামনে পুরুষরা সম্মান রক্ষার্থে হলেও প্রাণপণ যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়।

নেতৃত্ব ও সেনাপতিমণ্ডলী:

প্রধান সেনাপতি: আবু সুফিয়ান।

ডানদিকের ও অশ্বারোহী বাহিনী: খালিদ বিন ওয়ালিদ।

বামদিকের বাহিনী: ইকরামা বিন আবু জাহাল।

পদাতিক বাহিনী: সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা (ভিন্ন বর্ণনায় আমর বিন আল আস)।

তীরন্দাজ বাহিনী: আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়াহ।

বিশেষ দৃষ্টব্য: এই পাঁচজন সেনাপতির প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

পতাকাবাহী: বনু আবদুদ দার গোত্র।

অভিযান: ৩য় হিজরীর ৫ই বা ৭ই শাওয়াল এই বাহিনী মক্কা থেকে রওনা হয়। প্রথমে আকীক এবং পরবর্তীতে ৩য় হিজরীর ৬ই শাওয়াল (বৃহস্পতিবার) ওহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী 'আয়নাইন' নামক স্থানে তারা শিবির স্থাপন করে।

মদিনায় যুদ্ধের সংবাদ ও মুসলিমদের পরামর্শ সভা

মক্কায় অবস্থানরত রাসুলুল্লাহর (সা.) চাচা আব্বাস (রা.) কুরাইশদের এই যুদ্ধযাত্রার খবর পেয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত হন। তিনি মদিনায় একটি জরুরি চিঠি পাঠান। দ্রুতগামী পত্রবাহক মাত্র ৩ দিনে মদিনায় পৌঁছে রাসুলুল্লাহর (সা.) হাতে চিঠিটি তুলে দেন। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) চিঠিটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে পড়ে শোনান। চিঠিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল:

শত্রুর সৈন্য সংখ্যা

অস্ত্রের বিবরণ

কুরাইশদের যুদ্ধযাত্রার খবর

মুসলিমদের তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষা ও গোয়েন্দাগিরি

সংবাদ পাওয়ার পর মুসলিমরা সার্বক্ষণিক প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি নেন। সালাতের সময়ও তারা অস্ত্র কাছে রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সার্বক্ষণিক পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন সাদ বিন মুয়াজ (রা.), উসাইদ বিন হুজায়ের (রা.) এবং সাদ বিন উবাদাহ (রা.)। এছাড়া আকস্মিক আক্রমণ এড়াতে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর

নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রবেশপথে প্রহরী এবং শত্রুর গতিবিধি নজরদারির জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়।

রাসুলুল্লাহর (সা.) স্বপ্ন ও যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের সামনে নিজের একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

"আল্লাহর শপথ! আমি একটি ভালো জিনিস দেখেছি। আমি দেখেছি, একটি গাভী জবেহ করা হচ্ছে। আমি আমার তলোয়ারের মাথায় কিছু ভঙ্গুরতা (ক্ষতি) দেখেছি। আরও দেখেছি যে, আমি আমার হাতটি একটি সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে ঢুকিয়েছি।"

স্বপ্নের ব্যাখ্যা: গাভী জবেহ হওয়ার অর্থ কিছু সাহাবির শাহাদাত; তলোয়ারের ভঙ্গুরতার অর্থ তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের শাহাদাত; এবং সুরক্ষিত বর্মের অর্থ মদিনা শহর।

এই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে রাসুলুল্লাহ (সা.) মত প্রকাশ করেন যে, মদিনার ভেতরে থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইসহ বেশ কিছু সাহাবি এই মত সমর্থন করেন। তবে হামজা (রা.)-সহ একদল উদ্যমী ও তরুণ সাহাবি মদিনার বাইরে উন্মুক্ত মাঠে গিয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করার জোরালো দাবি জানান। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি সম্মান জানিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের মত পরিবর্তন করেন এবং মদিনার বাইরে ওহুদ প্রান্তরে গিয়ে যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ও বিন্যাস

১৪ই শাওয়াল, শুক্রবার আসরের সালাতের পর ১,০০০ সৈন্যের মুসলিম বাহিনী ওহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

পতাকা বণ্টন

মুহাজির বাহিনী: মুসআব বিন উমাইর (রা.)।

আউস গোত্র (আনসার): উসাইদ বিন হুজাইর (রা.)।

খাজরাজ গোত্র (আনসার): হুবাব ইবনুল মুনজির (রা.)।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের ফেরত পাঠানো

যুদ্ধের ভয়াবহতা বিবেচনা করে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), জায়েদ বিন সাবিত (রা.), উসামা বিন জায়েদ (রা.), আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-সহ অপ্রাপ্তবয়স্ক সাহাবিদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা

'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছে যখন উভয় বাহিনী একে অপরকে দেখতে পায়, তখন মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদিনার বাইরে এসে যুদ্ধ করার অজুহাত তুলে তার ৩০০ অনুসারী নিয়ে মদিনায় ফিরে যায়। ফলে মুসলিম বাহিনী ৭০০ সৈন্যে পরিণত হয়।

ওহুদ যুদ্ধের মূল ঘটনাবলি

রাসুলুল্লাহ (সা.) ভিন্ন পথ অবলম্বন করে কুরাইশ বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে ওহুদ পাহাড়ের সামনে অবস্থান নেন।

তীরন্দাজ বাহিনীর কৌশলগত অবস্থান

ওহুদ পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে যেন কুরাইশরা পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে, সেজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজের একটি

দলকে 'জাবালে আয়নাইন' (বর্তমানে জাবালে রুমাত) পাহাড়ে নিযুক্ত করেন। তিনি কঠোর নির্দেশ দেন:

"আমাদের জয় হোক বা পরাজয়, কোনো অবস্থাতেই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না। যদি দেখ আমাদের পাখিরা খুবলে খাচ্ছে, তবুও আমার বার্তা না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না।"

কুরাইশদের রাজনৈতিক চাল

যুদ্ধ শুরুর ঠিক পূর্বে আবু সুফিয়ান আনসারদের কাছে বার্তা পাঠায় যে, কুরাইশদের লড়াই কেবল মুহাজিরদের (মক্কার মুসলিমদের) সাথে, আনসারদের সাথে নয়। আনসাররা যেন যুদ্ধ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু আনসার সাহাবিরা এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়: মুসলিমদের অভাবনীয় সাফল্য

কুরাইশদের পতাকা পতন: কুরাইশদের প্রধান বীর ও পতাকাবাহী তালহা ইবনে আবি তালহা দ্বন্দ্বে নিহত হওয়ার পর বনু আবদুদ দারের একে একে ১০ জন পতাকাবাহী মুসলিমদের আঘাতে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের ২২ জন সৈন্য শুরুতেই নিহত হলে তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে।

আবু দুজানার বীরত্ব: রাসুলুল্লাহর (সা.) প্রদত্ত বিশেষ তলোয়ার নিয়ে আবু দুজানা (রা.) বীরদর্পে শত্রুসেনাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন।

হানজালা (রা.)-এর শাহাদাত: নতুন বিবাহিত হানজালা (রা.) গোসলের ফরয অবস্থা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের ডাক শুনে ময়দানে ছুটে আসেন। তিনি আবু সুফিয়ানকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন, এমন সময় শাদ্দাদ ইবনে আওসের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) জানান, ফেরেশতারা তাকে গোসল করাচ্ছেন, যার ফলে তাঁর নাম হয় 'হানজালাতুল গাসিল' (ফেরেশতা কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত)।

হামজা (রা.)-এর শাহাদাত: রাসুলুল্লাহর (সা.) চাচা আমির হামজা (রা.) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। জুবায়ের ইবনে মুতআমের গোলাম ওয়াহশী ইবনে হারব দূর থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে এই মহান বীরকে শহীদ করে।

যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন ও বিপর্যয়

মুসলিমদের তীব্র আক্রমণে কুরাইশরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করে। মক্কার নারীরাও দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে থাকে। মুসলিমদের বিজয় তখন সুনিশ্চিত মনে হচ্ছিল।

তীরন্দাজদের মারাত্মক ভুল

কুরাইশদের পালিয়ে যেতে দেখে এবং মুসলিমদের গনিমত (যুদ্ধের মালপত্র) সংগ্রহ করতে দেখে গিরিপথে থাকা তীরন্দাজদের সিংহভাগ রাসুলুল্লাহর (সা.) নির্দেশ ভুলে পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসেন। আমীর আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের মাত্র ১০ জন সঙ্গী নিয়ে পাহাড়েই থেকে যান।

খালিদ বিন ওয়ালিদের পাল্টা আক্রমণ

গিরিপথটি প্রায় শূন্য দেখে কুরাইশ অশ্বারোহী বাহিনীর নেতা খালিদ বিন ওয়ালিদ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি পেছন থেকে ঘুরে এসে গিরিপথের অবশিষ্ট তীরন্দাজদের শহীদ করে সরাসরি মুসলিম বাহিনীর ওপর পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালান। পালিয়ে যাওয়া কুরাইশরাও আবার ঘুরে দাঁড়ায়।

মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় ও রাসুলুল্লাহর (সা.) শাহাদাতের গুজব

উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে মুসলিম পতাকাবাহী মুসআব বিন উমাইর (রা.) শহীদ হন। তাঁর চেহারা রাসুলুল্লাহর (সা.) সদৃশ হওয়ায় কুরাইশ কাফের ইবনে কামিয়াহ ঘোষণা করে দেয় যে, "মুহাম্মদ

(সা.) নিহত হয়েছেন।" এই গুজবে সাহাবিদের মনোবল ভেঙে যায় এবং যুদ্ধের তীব্রতা চরমে পৌঁছায়।

রাসুলুল্লাহর (সা.) বীরত্ব ও আত্মত্যাগ

এই চরম সংকট মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহাবিদের উচ্চকণ্ঠে ডাক দেন: "আল্লাহর বান্দারা, তোমরা এদিকে এসো।" তাঁর কণ্ঠ শুনে সাহাবিরা আবার সমবেত হতে শুরু করেন।

রাসুলুল্লাহর (সা.) ওপর সরাসরি আক্রমণ

মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে লক্ষ্য করে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন তাঁর পাশে মাত্র ৭ জন আনসার এবং ২ জন কুরাইশ (তালহা ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস) সাহাবি ছিলেন। ৭ জন আনসারই যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন।

উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাসের পাথরের আঘাতে রাসুলুল্লাহর (সা.) নিচের ঠোঁট জখম হয় এবং একটি দাঁত (রুবাঈ) মোবারক শহীদ হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাবের আঘাতে তাঁর কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে।

ইবনে কামিয়াহর তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর গণ্ডদেশে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ঢুকে যায়।

রক্ত মুছতে মুছতে রাসুলুল্লাহ (সা.) আফসোস করে বলছিলেন, "সেই জাতি কীভাবে সফল হবে, যারা তাদের নবীর চেহারা রক্তরঞ্জিত করে, অথচ তিনি তাদের আল্লাহর দিকে ডাকছিলেন।" এই প্রেক্ষাপটে সূরা আলে ইমরানের ১২৮ নম্বর আয়াত নাজিল হয়।

মুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয় ও যুদ্ধ সমাপ্তি

আবু বকর (রা.), তালহা (রা.), আলী (রা.), আবু দুজানা (রা.) এবং উম্মু উমারা (রা.)-সহ প্রায় ৩০ জন সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মানববর্ম তৈরি করে রক্ষা করেন। পরবর্তীতে মুসলিমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে ওহুদ পাহাড়ের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে আশ্রয় নেন। কুরাইশরা পাহাড়ের ওপরে আক্রমণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) নিহত হয়েছেন মনে করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিদায়লগ্নে তারা মুসলিম শহীদদের লাশের নাক-কান কেটে বিকৃত (মুসলাহ) করে, যার মধ্যে আমির হামজা (রা.)-এর কলিজা চিবানোর নৃশংস ঘটনাও ঘটায় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা।

উহুদ যুদ্ধের পরিসংখ্যান ও পরবর্তী ঘটনা

শহীদ ও নিহতের সংখ্যা: ওহুদ যুদ্ধে মোট ৭০ জন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন (৪১ জন খাজরাজ, ২৪ জন আউস, ৪ জন মুহাজির এবং ১ জন ইহুদি)। কুরাইশদের পক্ষে নিহত হয় প্রায় ৩৭ জন।

নারী সাহাবিদের ভূমিকা: উম্মু উমারা (রা.) সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে রক্ষা করেন। আয়েশা (রা.), উম্মু সুলাইম (রা.) এবং উম্মু সালীম পিঠে পানির মশক বহন করে আহতদের সেবা করেন। উম্মু আইমান (রা.) মদিনায় পলায়নপর সৈন্যদের তিরস্কার করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

যুদ্ধবন্দী: এই যুদ্ধে আবু ইজ্জা জুমাহী এবং মুয়াবিয়া ইবনে মুগিরা নামক দুজন মুশরিক বন্দী হয়। আবু ইজ্জা বদর যুদ্ধে দয়াপরশ হয়ে মুক্তি পেলেও আবারও চুক্তিভঙ্গ করায় রাসুলুল্লাহ (সা.) তার মৃত্যুদণ্ড দেন এবং বলেন, "মুমিন এক গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না।" মুয়াবিয়া ইবনে মুগিরাকে ৩ দিনের মধ্যে মদিনা ছাড়ার শর্ত দেওয়া হলেও সে গুপ্তচরবৃত্তি করায় তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

রাজী-এর মর্মান্তিক ঘটনা (৪ হিজরী)

উহুদ যুদ্ধের পর ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে আদল ও কারাহ গোত্রের কিছু লোক দ্বীন শেখার কথা বলে মদিনা থেকে ১০ জন সাহাবিকে নিয়ে যায়। কিন্তু মদিনা ও রাবেগের মধ্যবর্তী 'রাজী' নামক স্থানে পৌঁছালে তারা বনু লাহইয়ান গোত্রের ১০০ জন তীরন্দাজকে সাহাবিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ফলে ৭ জন সাহাবি যুদ্ধ করে শহীদ হন এবং খুবাইব (রা.) ও জায়েদ বিন দাসিন্নাহ (রা.)-কে মক্কার কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়, যাদের পরবর্তীতে মক্কায় নির্মমভাবে শহীদ করা হয়।

বি'রে মাউনার মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি (Bi'r Maunah)

'রাজী'-এর বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরপরই (একই হিজরী সালের সফর মাসে) ইসলামের ইতিহাসে আরও একটি ভয়াবহ ও কলঙ্কজনক বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটে, যা বি'রে মাউনার ট্র্যাজেডি নামে পরিচিত।

ঘটনার সূত্রপাত

আবু বারা আমের বিন মালিকের আগমন: নজদের বনু আমের গোত্রের নেতা আবু বারা আমের বিন মালিক মদিনায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে ইসলাম গ্রহণও করেনি, আবার প্রত্যাখ্যানও করেনি। তবে সে অনুরোধ করে, নজদবাসীদের দ্বীন শেখানোর জন্য একদল সাহাবিকে যেন তার সাথে পাঠানো হয় এবং সে এই সাহাবিদের নিরাপত্তার (আমল) জামিনদার হয়।

সাহাবিদের দল প্রেরণ: আবু বারার নিরাপত্তার আশ্বাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর ৪০ জন (মতান্তরে ৭০ জন) যোগ্য ও ক্বারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) সাহাবির একটি দল নজদের উদ্দেশ্যে পাঠান।

বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যাকাণ্ড

সাহাবিদের দলটি নজদ এলাকার 'বি'রে মাউনা' (মাউনা কূপ) নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন।

সেখান থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি চিঠি নিয়ে সাহাবি হারাম বিন মিলহান (রা.) বনু আমের গোত্রের তৎকালীন প্রধান আমের বিন তুফাইলের কাছে যান।

কুখ্যাত আমের বিন তুফাইল চিঠিটি পড়ে দেখাতো দূরের কথা, উল্টো পিছন থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হারাম বিন মিলহান (রা.)-কে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়।

এরপর আমের বিন তুফাইল বাকি সাহাবিদেরও হত্যা করার জন্য নিজের গোত্রকে আহ্বান জানায়। কিন্তু আবু বারার দেওয়া নিরাপত্তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে বনু আমের গোত্র এতে অস্বীকৃতি জানায়।

তখন আমের বিন তুফাইল বনু সুলাইম গোত্রের শাখা— উসাইয়্যাহ, রিল ও জাকওয়ান— কে উস্কে দেয়। তারা আমেরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহাবিদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং নৃশংসভাবে প্রায় সবাইকে শহীদ করে।

একমাত্র জীবিত সাহাবি: এই গণহত্যা থেকে কেবল কা'ব ইবনে জায়েদ ইবনে নাজজার (রা.) অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। কাফেররা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে গিয়েছিল, পরবর্তীতে মুসলিমরা তাকে উদ্ধার করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গভীর শোক ও কুনুতে নাজেলা

ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুযায়ী, 'রাজী' এবং 'বি'রে মাউনা'—এই দুটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংবাদ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে একই রাতে এসে পৌঁছায়। সাহাবিদের এই আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি এতটাই মর্মাহত ও ব্যথিত হন যে, টানা এক মাস ধরে ফজরের

সালাতে খুনি গোত্রগুলোর (রিল, জাকওয়ান, লাহইয়ান এবং উসাইয়্যাহ) নাম ধরে অভিশাপ দিয়ে কুনুতে নাজেলা পাঠ করেন।

বনু নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের কারণ

রাজী ও বি'রে মাউনার ঘটনার পর মদিনার ইহুদিরা মুসলিমদের দুর্বল ভাবতে শুরু করে এবং ধৃষ্টতার চূড়ান্ত সীমানা অতিক্রম করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এর ফলেই বনু নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে ওঠে।

ইহুদিদের হত্যার ষড়যন্ত্র (The Assassination Plot)

বি'রে মাউনার ঘটনার পর ফেরার পথে সাহাবি আমর ইবনে উমাইয়্যা জামরী (রা.) ভুলবশত বনু কিলাব গোত্রের দুজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন (যাদের রাসুলুল্লাহ সা. নিরাপত্তা দিয়েছিলেন)। সেই নিহতদের রক্তপণ (দিয়ত) পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে রাসুলুল্লাহ (সা.) কয়েকজন সাহাবিকে সাথে নিয়ে মদিনার ইহুদি গোত্র বনু নাযীর-এর আবাসে যান।

ইহুদিরা মুখে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে একটি দেয়ালের পাশে বসতে বলে। তিনি দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

এই সুযোগে ইহুদিরা গোপনে ষড়যন্ত্র করে যে, দেয়ালের ছাদ থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মাথার ওপর একটি বিশাল পাথর ফেলে তাকে হত্যা করা হবে।

ঠিক এই মুহূর্তে জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ইহুদিদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো কথা না বলে অত্যন্ত দ্রুত সেখান থেকে উঠে মদিনার দিকে রওনা হন। পরে সাহাবিরাও তাঁর সাথে এসে মিলিত হন।

১০ দিনের আল্টিমেটাম ও মুনাফিকদের উস্কানি

মদিনায় ফিরে রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবি মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে বনু নাযীরের কাছে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান:

"তোমরা আগামী ১০ দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। ১০ দিন পর মদিনায় তোমাদের কাউকে পাওয়া গেলে তার শিরশ্ছেদ করা হবে।"

এই নির্দেশ পেয়ে ইহুদিরা মদিনা ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু মদিনার মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তাদের মদিনা ছাড়তে নিষেধ করে বার্তা পাঠায়:

"তোমরা মদিনা ছাড়ো না। আমার অধীনে দুই হাজার সৈন্য রয়েছে, যারা বনু নাযীরকে রক্ষা করার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। এমনকি যুদ্ধ হলে বনু কুরাইজা গোত্রও তোমাদের সাহায্য করবে।"

মুনাফিকদের এই আশ্বাসে বনু নাযীরের নেতারা আশ্বস্ত হয় এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সাফ জানিয়ে দেয় যে, তারা মদিনা ছাড়বে না; মুসলিমরা চাইলে যা ইচ্ছা করতে পারে।

বনু নাযীর অবরোধ ও চূড়ান্ত পরিণতি

ইহুদিদের চ্যালেঞ্জ পাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন।

মদিনার দায়িত্ব: আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদিনার ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত করা হয়।

যুদ্ধের পতাকা: আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিয়ে মুসলিম বাহিনী বনু নাযীরের দুর্গের দিকে রওনা হয় এবং দুর্গটি অবরুদ্ধ করে।

অবরোধের ঘটনা: ইহুদিরা দুর্গের ভেতর থেকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। দুর্গের সামনে থাকা ঘন খেজুর বাগান মুসলিমদের সামরিক তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করায়, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলা ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা হাশরের ৫ নম্বর আয়াত নাজিল করে মুসলিমদের এই পদক্ষেপকে বৈধতা দেন:

"তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন।" (সূরা হাশর, ৫৯:৫)

বনু নাযীরের পরাজয় ও মদিনা ত্যাগ

মুনাফিক ও মিত্রদের বিশ্বাসঘাতকতা: অবরোধের মুখে প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বনু কুরাইজা ইহুদিরা বনু নাযীরকে কোনো সাহায্য করেনি এবং মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও তার দেওয়া সেনা দল পাঠায়নি।

আত্মসমর্পণ: টানা ৬ দিন (মতান্তরে ১৫ দিন) অবরুদ্ধ থাকার পর ইহুদিদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তারা অস্ত্র সমর্পণ করে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হয়।

দেশত্যাগের শর্ত: রাসুলুল্লাহ (সা.) শর্ত দেন, তারা কোনো যুদ্ধাস্ত্র সাথে নিতে পারবে না। তবে অস্ত্র ছাড়া পরিবার-পরিজনসহ নিজেদের উটের পিঠে যতটুকু মালামাল বোঝাই করে নেওয়া সম্ভব, ততটুকু নিয়ে যেতে পারবে।

গন্তব্য: এই শর্তে ইহুদিরা উটের পিঠে ঘরের দরজা-জানালা পর্যন্ত বোঝাই করে মদিনা ত্যাগ করে। তাদের একটি বড় দল এবং নেতারা খাইবার অভিমুখে চলে যায় এবং আরেকটি দল সিরিয়ার দিকে চলে যায়।

ফলাফল ও ফায় (Fay) সম্পদ

বনু নাযীরের ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র, জমি এবং বাড়ি-ঘর কোনো যুদ্ধ ছাড়াই সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অধীনে আসে (যাকে শরীয়তের ভাষায় 'ফায়' সম্পদ বলা হয়)।

বিশেষ দৃষ্টব্য: সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণের কারণে কুরআন মাজিদের 'সূরা হাশর'-কে 'সূরা বনু নাযীর' বলে ডাকতেন

৭.৬ খন্দক ও বনু কুরাইজার যুদ্ধ: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, রণকৌশল ও অলৌকিক ঘটনাবলী

১. খন্দক (আহযাব) যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও কাফেরদের জোট গঠন

মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ইহুদিদের কট্টর গোত্র 'বনু নাযির' খাইবারে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার চক্রান্ত শুরু করে। তারা আরবের বিভিন্ন মূর্তিপূজারী গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উস্কানি দিতে থাকে। তারা মক্কার কুরাইশদের কাছে গিয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তাব দিলে কুরাইশরা আনন্দের সাথে রাজি হয়। এরপর তারা 'বনু গাতফান' গোত্রের কাছে যায় এবং মদীনার খোরমার লোভ দেখিয়ে তাদেরকেও এই জোটে শামিল করে। কুরাইশ ও গাতফান ছাড়াও আরও বেশ কিছু গোত্র এই সম্মিলিত বাহিনীতে যোগ দেয়, যার কারণে কুরআনে একে 'আহযাব' বা সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ বলা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকদের খুশি করতে ইহুদি প্রতিনিধি দল এমনকি এও বলেছিল, *"তোমাদের ধর্ম ও মূর্তিপূজা মোহাম্মদের দ্বীনের চেয়ে উত্তম এবং তোমরাই সত্যের বেশি কাছাকাছি আছ।"*

ইহুদি ও বনু গাতফানের মধ্যকার চুক্তি:

প্রথম শর্ত: বনু গাতফান গোত্র তাদের ৬,০০০ সৈন্য নিয়ে এই যৌথ বাহিনীতে অংশ নেবে।

দ্বিতীয় শর্ত: এর বিনিময়ে ইহুদিরা খাইবারের পুরো এক বছরের উৎপাদিত খোরমা (খেজুর) বনু গাতফান গোত্রকে দিয়ে দেবে।

এভাবে ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রায় ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়।

২. মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও খন্দক (পরিখা) খনন

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী কাফেরদের এই বিশাল পরিকল্পনার খবর অনতিবিলম্বে তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক ডাকলেন এবং মদীনা রক্ষার উপায় নিয়ে পরামর্শ চাইলেন।

এই সংকটময় মুহূর্তে পারস্যের সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.) একটি চমৎকার পারসিক রণকৌশলের প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, *"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দেশে যখন কোনো বিশাল শত্রু বাহিনী আক্রমণ করত, তখন আমরা শহরের চারপাশে পরিখা (গভীর গর্ত) খনন করে নিজেদের রক্ষা করতাম।"* রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ সানন্দে এই নতুন ও দূরদর্শী প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন।

পরিখা খননের কৌশল:

মদীনার তিন দিকে পাহাড়, খেজুর বাগান ও ঘরবাড়ি থাকায় প্রাকৃতিকভাবেই তা সুরক্ষিত ছিল। কেবল উত্তর দিকটি ছিল উন্মুক্ত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার উত্তর দিকে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। আরব ভূখণ্ডের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম পরিখা খননের ঘটনা, যা কাফেরদের সমস্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

প্রস্তুতির মূল বিষয়সমূহ:

১. **পরিবারের নিরাপত্তা:** রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মুসলিম মুজাহিদদের স্ত্রী ও সন্তানদের সুরক্ষার জন্য মদীনার নিরাপদ দুর্গগুলোতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন।

২. **রাসূল ﷺ-এর সশরীরে অংশগ্রহণ:** পরিখা খননের কঠিন পরিশ্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সাধারণ সাহাবীদের মতো কোদাল ও ঝুড়ি হাতে অংশ নেন।

৩. **ক্ষুধার কষ্ট ও ধৈর্য:** খন্দকের দিনগুলোতে সাহাবী ও রাসূল ﷺ চরম ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছেন। সাহাবীগণ ক্ষুধার তীব্রতায় পেটে একটা করে পাথর বেঁধে রাসূল ﷺ-কে দেখালে, তিনি তাঁর গায়ের চাদর তুলে দেখান যে তাঁর পবিত্র পেটে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

৪. **মানসিক মনোবল বৃদ্ধি:** খননকাজের ক্লান্তি দূর করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনোদনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং নবীজী ﷺ নিজে কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দিয়ে সবার মনোবল চাঙ্গা রাখতেন।

৫. **শৃঙ্খলা বজায় রাখা:** খননকাজে লিপ্ত সাহাবীদের কোনো জরুরি প্রয়োজন হলে তারা রাসূল ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে যেতেন এবং কাজ শেষ করে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজে যোগ দিতেন।

৬. **নিরাপত্তা প্রহরা:** পরিখা খননকালে কাফেররা যাতে হঠাৎ আক্রমণ করতে না পারে, সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৩. পরিখা খননকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী (মুজেযাসমূহ)

১. **হযরত জাবের (রা.)-এর ঘরের বরকত:** হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) রাসূল ﷺ-এর ক্ষুধার কষ্ট দেখে ঘরে গিয়ে একটি ছাগলের বাচ্চা জবাই করলেন এবং তাঁর স্ত্রী ১ সা (প্রায় আড়াই কেজি) আটা পিষে রুটি বানানোর প্রস্তুতি নিলেন। জাবের (রা.) অত্যন্ত গোপনে রাসূল ﷺ-কে অল্প কয়েকজন সাহাবীসহ খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিখা খননরত প্রায় ১,০০০ সাহাবীকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। খাওয়ার আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেই আটা ও তরকারির পাত্রে থুতু মোবারক দিয়ে বরকতের দোয়া করলেন। অলৌকিকভাবে, ১,০০০ সাহাবীর প্রত্যেকেই পেট পুরে মাংস-রুটি খেলেন, অথচ ডেকচির তরকারি ও আটার পরিমাণ শুরুর মতোই অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল।

২. **সামান্য খেজুরে বরকত:** হযরত নুমান বিন বশির (রা.)-এর বোন তাঁর বাবা ও মামার জন্য সামান্য কিছু খেজুর নিয়ে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে একটি চাদরের ওপর খেজুরগুলো ছড়িয়ে দিলেন এবং সব খন্দকবাসীকে ডাকলেন। সমস্ত সাহাবী তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও খেজুরের পরিমাণ কমেনি, বরং চাদরের চারপাশ দিয়ে উপচে পড়ছিল।

৩. **বিশাল পাথর চূর্ণ হওয়া:** খননকাজের সময় একটি বিশাল শক্ত পাথর সাহাবীদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যা কেউ ভাঙতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এসে সেই পাথরের ওপর কুঠার দিয়ে আঘাত করলেন এবং পাথরটি বালির স্তূপের মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

৪. যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও কাফেরদের বিপর্যয়

কুরাইশদের ৪,০০০ এবং বনু গাতফানের ৬,০০০ সহ মোট ১০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী যখন মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছাল, তখন এই বিশাল শত্রু দেখে সত্যিকারের মুমিনদের ঈমান ও আল্লাহর প্রতি ভরসা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু মুনাফিক ও দুর্বল

ঈমানের অধিকারীরা ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং বাড়ি ফিরে যাওয়ার অজুহাত খুঁজতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩,০০০ সৈন্য নিয়ে 'সালা' পাহাড়কে পেছনে রেখে খন্দকের ওপারে শিবির স্থাপন করলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাঙ্কেতিক কোড বা পাসওয়ার্ড ছিল— *"হা মীম, লা ইউনসারুন"* (হা মীম, কাফেরদের সাহায্য করা হবে না)।

মুশরিকরা মদীনার সামনে এসে খন্দক দেখে হতভম্ব হয়ে গেল, কারণ এই রণকৌশলের সাথে তারা পরিচিত ছিল না। তারা পরিখা পার হওয়ার জন্য কোনো দুর্বল জায়গা খুঁজছিল। সাহাবীগণ খন্দকের ওপার থেকে অনবরত তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে দূরে রাখছিলেন। এর মধ্যেই আমর ইবনে আবদ উদ-সহ তিনজন কুখ্যাত মুশরিক যোদ্ধা পরিখার একটি সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে ওপারে চলে আসে। হযরত আলী (রা.) বীরত্বের সাথে এগিয়ে গিয়ে আমর ইবনে আবদ উদ-কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তরবারি দিয়ে হত্যা করেন। এই দৃশ্য দেখে বাকি মুশরিকরা ভয়ে পালিয়ে যায়। শত্রুদের অনবরত আক্রমণের কারণে সেদিন মুসলমানদের যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা— এই ৪ ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে যায়, যা সূর্যাস্তের পর রাসূল ﷺ সাহাবীদের নিয়ে একসাথে আদায় করেন। এই যুদ্ধে মুখোমুখি বড় কোনো লড়াই হয়নি, মূলত তীর নিক্ষেপ এবং খন্দক পাহারা দেওয়ার মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। তীরের আঘাতে ৬ জন মুসলিম শহীদ হন এবং ১০ জন মুশরিক নিহত হয়। মুসলিমদের মধ্যে বনু আউস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) তীরের আঘাতে মারাত্মক আহত হন।

৫. বনু কুরাইজার চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা

মদীনার ভেতরে অবরুদ্ধ থাকা ইহুদি গোত্র 'বনু কুরাইজা'-র সাথে মুসলমানদের শান্তি চুক্তি ছিল যে তারা মদীনা রক্ষায় সাহায্য করবে। কিন্তু বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব চরম উস্কানি দিয়ে বনু কুরাইজার নেতা কা'ব ইবনে আসাদকে প্ররোচিত করে। বারবার প্রলোভন দেখানোর পর কা'ব মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের সাথে হাত মেলাতে সম্মত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই খবর পেয়ে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কয়েকজন সাহাবীকে পাঠালেন। তারা অনুসন্ধান করে খবরের সত্যতা পেলেন এবং মদীনায় ফিরে এসে রাসূল ﷺ-এর কাছে গোপন সাংকেতিক ভাষায় বললেন— *"আযাল ও কারাহ"*। (এর অর্থ ছিল, অতীতে আযাল ও কারাহ গোত্র যেমন মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বনু কুরাইজাও ঠিক তাই করেছে)।

এই খবর ছড়িয়ে পড়লে মুনাফিকরা বলতে লাগল, আমাদের ঘরবাড়ি তো অরক্ষিত, আমাদের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন। পরিস্থিতি এতই জটিল হয়ে পড়েছিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে রইলেন, যা দেখে সাহাবীগণ চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের ওহী এলে তিনি "আল্লাহু আকবার" বলে আশার বাণী শোনালেন।

৬. আল্লাহর সাহায্য ও যুদ্ধের সমাপ্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অভিনব কূটনৈতিক চাল চাললেন। বনু গাতফানের দুই নেতা উয়াইনা ইবনে হিসন ও হারিস ইবনে আউফের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে, তারা যদি যুদ্ধ ছেড়ে চলে যায় তবে মদীনার উৎপাদিত ফলের এক-তৃতীয়াংশ তাদেরকে দেওয়া হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে নবীজী ﷺ হযরত সা'দ বিন মুআয ও সা'দ বিন উবাদাহ (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা বললেন, *"এটি যদি আল্লাহর নির্দেশ হয় তবে আমরা মাথা পেতে নেব। আর যদি আপনার ব্যক্তিগত মত হয়, তবে কাফেরদের তরবারি ছাড়া আমরা একদানা খেজুরও দেব না।"* ফলে চুক্তিটি আর হয়নি।

হযরত নুয়াইম (রা.)-এর ভূমিকা:

এরই মধ্যে বনু গাতফান গোত্রের নুয়াইম ইবনে মাসউদ (রা.) গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, *"আমি মুসলিম হয়েছি, কিন্তু কাফেররা তা জানে না। আমাকে কোনো আদেশ দিন।"* রাসূল ﷺ বললেন, *"তুমি একা সৈন্য হিসেবে লড়াই করতে পারবে না, তবে কৌশলে ওদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দাও। কারণ যুদ্ধ হলো এক ধরণের কৌশল ও কূটনীতি।"* হযরত নুয়াইম (রা.) তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় কুরাইশ এবং বনু কুরাইজা ইহুদিদের মধ্যে এমন এক অবিশ্বাস তৈরি করলেন যে, তারা একে অপরকে শত্রু ভাবতে শুরু করল এবং তাদের যৌথ জোট ভেঙে গেল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়:

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন: *"হে কিতাব নাজিলকারী! হে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! এই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত ও কম্পিত করে দিন।"* আল্লাহ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করলেন। ৫ম হিজরীর জিলকদ মাসের এক রাতে কাফেরদের ওপর তীব্র ঝড়ো হাওয়া ও শৈত্যপ্রবাহ পাঠালেন। সেই ঘূর্ণিঝড়ে কাফেরদের তাঁবু উপড়ে গেল, রান্নার পাতিল উল্টে গেল এবং তারা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তীব্র শীতের সেই রাতে রাসূল ﷺ হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.)-কে

শত্রু শিবিরের খবর নিতে পাঠালেন। হুযাইফা এসে দেখলেন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেররা মক্কা পলায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরদিন সকালে দেখা গেল পুরো ময়দান সাফ। কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াই আল্লাহ মুমিনদের বিজয় দান করলেন।

৭. বনু কুরাইজার যুদ্ধ ও তাদের চূড়ান্ত বিচার

খন্দক যুদ্ধ শেষ করে মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কেবল অস্ত্র গোছাচ্ছিলেন, ঠিক যোহরের সময় হযরত জিবরীল (আ.) এসে বললেন, *"আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? ফেরেশতারা তো এখনও অস্ত্র রাখেনি। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, এখনই বনু কুরাইজার দিকে অগ্রসর হোন। আমি সামনে গিয়ে ওদের দুর্গে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছি।"*

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করে দিলেন, *"যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো, তারা বনু কুরাইজায় পৌঁছানোর আগে যেন আসরের সালাত আদায় না করে।"* তিনি হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিয়ে ৩,০০০ সাহাবীর বাহিনী নিয়ে বনু কুরাইজা অবরোধ করলেন। ২৫ দিন অবরোধের পর ইহুদিরা নিরুপায় হয়ে হজ্জের সময় তাদের মিত্র থাকা বনু আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে সালিশ মেনে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলো।

হযরত আবু লুবাবাহ (রা.)-এর ঘটনা:

আত্মসমর্পণের আগে ইহুদিরা রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করে তাদের পুরনো বন্ধু আবু লুবাবাহকে পরামর্শের জন্য পাঠাতে বলে। আবু লুবাবাহ সেখানে গেলে ইহুদি নারী ও শিশুদের কান্না দেখে তাঁর মনে দয়া জাগে। ইহুদিরা জিজ্ঞেস করল, *"আমরা কি আত্মসমর্পণ করব?"* তিনি বললেন, *"হ্যাঁ"*, কিন্তু সাথে সাথে নিজের গলার দিকে হাত ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে আত্মসমর্পণ করলে সবার মৃত্যুদণ্ড হবে। ইশারা করেই তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করে ফেলেছেন। তিনি লজ্জিত হয়ে মদীনায় ফিরে মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে রাখলেন, যতদিন না আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করে ওহী নাজিল করেছিলেন।

হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর ফয়সালা:

গুরুতর আহত হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে যখন বিচারক হিসেবে আনা হলো, বনু আউসের লোকেরা তাকে ইহুদিদের প্রতি নরম হওয়ার অনুরোধ করছিল। কিন্তু সা'দ (রা.) বললেন, *"আজ সা'দ আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না।"*

তিনি দুই পক্ষের উপস্থিতি দেখে তাঁর চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করলেন:
১. বনু কুরাইজার সমস্ত লড়াকু পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।
২. নারী ও শিশুদের বন্দী করা হোক।
৩. তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হোক।
এই রায় শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, **"হে সা'দ! তুমি ঠিক সেই বিচারই করেছ, যা সাত আসমানের ওপর থেকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করেছেন।"** এই রায়ের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতক ও চুক্তিভঙ্গকারী বনু কুরাইজা ইহুদিদের মদীনা থেকে চিরতরে নির্মূল করা হয়।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ (গাজওয়াতুল মুরাইসী)

অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তার মতে, এই যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি

শত্রুর ষড়যন্ত্র: বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দার হারেস বিন আবী যেরার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিজস্ব এবং অন্যান্য গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

মুসলিম বাহিনীর যাত্রা: রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর গোয়েন্দা মারফত এই সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করার পর সাহাবিদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। শাবান মাসের ২ তারিখে মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে রওনা হয়।

মুনাফিকদের অংশগ্রহণ: ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধেই প্রথমবারের মতো মুনাফিকদের একটি বড় দল বিপুল সংখ্যায় মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেয় (মূলত গণিমতের মালের লোভে)।

যুদ্ধ ও মুসলিমদের বিজয়

মুসলিম বাহিনী যখন 'মুরাইসী' নামক কূপের নিকট পৌঁছায়, তখন বনু মুস্তালিক গোত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মূল পতাকা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর হাতে এবং আনসারদের বিশেষ পতাকাটি ছিল হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)-এর হাতে।

প্রথমে কিছুক্ষণ তীর বিনিময় হওয়ার পর, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে সাহাবিরা তীব্র আক্রমণ চালান। ফলে শত্রুবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়। তাদের কিছু সৈন্য নিহত হয় এবং নারী ও শিশুসহ বাকিরা বন্দী হয়। প্রচুর গবাদিপশু মুসলিমদের গণিমত হিসেবে হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মাত্র একজন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.)-এর সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহ

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বনু মুস্তালিকের সর্দার হারেস বিন আবী যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়া (রা.)-ও ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) জুয়ায়রিয়া (রা.)-এর মুক্তিপণ নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করেন এবং পরবর্তীতে তাকে বিবাহ করেন।

এই বিবাহের ফলে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে; সাহাবিরা বলতে থাকেন— "বনু মুস্তালিকের লোকেরা এখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শ্বশুরকুলের মানুষ।" এই সম্মানে সাহাবিরা বনু মুস্তালিক গোত্রের প্রায় একশো পরিবারের সমস্ত বন্দীকে বিনামূল্যে মুক্ত করে দেন। এই মহানুভবতা দেখে বনু মুস্তালিক গোত্রের সকলেই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

২. ঐতিহাসিক ইফকের ঘটনা (মিথ্যা অপবাদ)

বনু মুস্তালিক (মুরাইসী) যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মুনাফিকরা মিথ্যা অপবাদ রটনা করে, যা ইতিহাসে 'ইফকের ঘটনা' নামে পরিচিত।

ঘটনার সূত্রপাত ও হারানো হার

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখনই কোনো সফরে যেতেন, স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। এই সফরে আয়েশা (রা.)-এর নাম আসায় তিনি সাথে যান।

যুদ্ধ শেষে মদিনায় ফেরার পথে, এক রাতে কাফেলা যখন মদিনার কাছাকাছি শিবির স্থাপন করে, তখন শেষরাতের দিকে কাফেলা ত্যাগের ঘোষণা দেওয়া হয়। আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে একটু দূরে যান।

ফিরে এসে তিনি দেখেন তাঁর গলার হারটি (যেমনের 'যাফার' শহরের পুঁতির তৈরি) কোথাও ছিঁড়ে পড়ে গেছে। তিনি পুনরায় সেই হারের খোঁজে যান, যার কারণে তাঁর ফিরতে বিলম্ব হয়।

এদিকে তাঁর হাওদা (উটের পিঠের ঘর) বহনকারী সাহাবিরা ভাবলেন আয়েশা (রা.) ভেতরেই আছেন (তখন তিনি বেশ হালকা গড়নের ছিলেন)। ফলে তারা উট নিয়ে রওনা হয়ে যান। আয়েশা (রা.) হারটি খুঁজে পেয়ে যখন শিবিরে ফিরে আসেন, তখন সেখানে কেউ ছিল না।

সাফওয়ান বিন মুআত্তাল (রা.)-এর আগমন

নিরুপায় হয়ে আয়েশা (রা.) তাঁর আগের স্থানেই বসে থাকেন এই ভেবে যে, কাফেলা তাঁর অনুপস্থিতি টের পেলে এখানেই ফিরে আসবে। একপর্যায়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

কাফেলার পেছনে ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র কুড়িয়ে নেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবি সাফওয়ান বিন মুআত্তাল (রা.) ভোরে সেই স্থানে পৌঁছান এবং ঘুমন্ত আয়েশা (রা.)-কে চিনে ফেলেন (পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার আগে তিনি তাকে দেখেছিলেন)।

আয়েশা (রা.)-কে দেখে তিনি উচ্চস্বরে পড়ে ওঠেন: "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী?" তাঁর আওয়াজে আয়েশা (রা.) জেগে ওঠেন এবং চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে নেন।

সাফওয়ান (রা.) নিজের উটটিকে বসিয়ে দেন। আয়েশা (রা.) উটের পিঠে আরোহণ করলে সাফওয়ান নিজে উটের লাগাম ধরে হেঁটে হেঁটে দুপুরের প্রখর রোদে কাফেলার সাথে গিয়ে মিলিত হন।

মুনাফিকদের অপপ্রচার ও মদিনার পরিস্থিতি

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত জঘন্য ও মিথ্যা অপবাদ রটনা করে।

মদিনায় ফেরার পর আয়েশা (রা.) প্রায় এক মাস প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন। তিনি এই অপপ্রচারের কিছুই জানতেন না, তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আচরণের পরিবর্তন (তিনি শুধু এসে জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কেমন আছো?") দেখে আয়েশা (রা.)-এর মনে তীব্র সন্দেহের উদ্রেক হয়।

পরে আসল ঘটনা জানতে পেরে আয়েশা (রা.) পিতা-মাতার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি নেন এবং সেখানে দিন-রাত কাঁদতে থাকেন।

ওহী নাজিল ও পবিত্রতা ঘোষণা

একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, "হে আয়েশা! তুমি যদি নির্দোষ হও তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন, আর যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।"

জবাবে আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি জানি আমি নির্দোষ, কিন্তু আপনারা মানুষের মুখের কথা শুনে ফেলেছেন। আমি শুধু হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর মতো বলব— 'সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল'।"

এরপরই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ওহী নাজিল হতে শুরু করে। ওহীর অবস্থা কেটে যাওয়ার পর তিনি হাসিমুখে বলেন, "হে আয়েশা! আনন্দ করো, আল্লাহ তোমার পবিত্রতা নাজিল করেছেন।" * আল্লাহ তায়ালা সূরা নূরের ১১ থেকে ২০ নম্বর পর্যন্ত মোট ১০টি আয়াত নাজিল করে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও সতীত্বের ঘোষণা দেন।

আবু বকর (রা.)-এর শপথ ও ক্ষমা: হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর এক দরিদ্র আত্মীয় 'মিস্তাহ'-কে আর্থিক সাহায্য করতেন, যিনি এই অপপ্রচারে লিপ্ত ছিলেন। আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা প্রমাণের পর আবু বকর (রা.) কসম খান যে তিনি আর মিস্তাহকে সাহায্য করবেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা নূরের ২২ নম্বর আয়াত নাজিল করে আত্মীয়দের ক্ষমা করার নির্দেশ দিলে, আবু বকর (রা.) পুনরায় সাহায্য শুরু করেন।

সূরা নূরের আলোকে 'ইফকের ঘটনা' থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

১. মুমিনদের একে অপরের প্রতি সর্বদা উত্তম ধারণা পোষণ করতে হবে।

২. কোনো সংবাদ ছড়ানোর আগে তার সত্যতা যাচাই-বাছাই করা বাধ্যতামূলক।

৩. ভিত্তিহীন অপপ্রচার ও সমাজ বা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি।

৪. শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা।

৫. আত্মীয়-স্বজন বা নিকটজনদের মন্দ আচরণ সত্ত্বেও তাদের প্রতি দান-সদকা সচল রাখা ও ক্ষমা করা।

৩. হুদায়বিয়ার সন্ধি: প্রেক্ষাপট ও চুক্তিসমূহ (৬ষ্ঠ হিজরী)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্বপ্ন ও মক্কার পথে যাত্রা

স্বপ্ন দর্শন: ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নে দেখেন যে তিনি সাহাবিদের নিয়ে অত্যন্ত নিরাপদ অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন এবং উমরাহ পালন করছেন।

কাফেলার যাত্রা: স্বপ্নের ভিত্তিতে ৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা জিলকদ তারিখে রাসুলুল্লাহ (সা.) ১৪০০ বা ১৫০০ জন সাহাবি এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে সাথে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হন। তারা মক্কার ইহরামের মীকাত 'জুলহুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছে কুরবানীর পশু চিহ্নিত করেন এবং ইহরাম বাঁধেন।

কুরাইশদের বাধা ও সাহাবিদের সাথে পরামর্শ

পথে খুযাআ গোত্রের এক গোয়েন্দা এসে খবর দেয় যে, কুরাইশরা মুসলিমদের মক্কায় প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য বিশাল সৈন্য সংগ্রহ করেছে এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ২০০ অশ্বারোহীর একটি দল 'কুরাউল গামিম' নামক স্থানে অবস্থান করছে।

এই খবর পেয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন যে যুদ্ধ করা উচিত নাকি উমরাহ করা উচিত। সিদ্ধান্ত হয়— তারা উমরার উদ্দেশ্যেই মক্কার দিকে এগোবেন, কেউ বাধা দিলে তবেই যুদ্ধ হবে।

কুরাইশদের অশ্বারোহী দল মুসলিমদের রুকু-সিজদারত অবস্থায় (আসরের সালাতে) আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে 'সালাতুল খওফ' (ভীতিপ্রদ সময়ের সালাত)-এর বিধান নাজিল হওয়ায় খালিদ বিন ওয়ালিদ আর সেই সুযোগ পাননি। রাসুলুল্লাহ (সা.) মূল রাস্তা এড়িয়ে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছান।

বাইয়াতে রিদওয়ান (গাছের নিচে শপথ)

আলোচনার জন্য মুসলিমদের পক্ষ থেকে হযরত উসমান (রা.)-কে মক্কায় কুরাইশদের কাছে পাঠানো হয়।

মক্কায় উসমান (রা.)-এর ফিরতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় মুসলিমদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কুরাইশরা উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে।

এই সংবাদ পেয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি বাবলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সাহাবিদের কাছ থেকে মরণপণ যুদ্ধ করার শপথ নেন, যা ইতিহাসে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। আল্লাহ তায়ালা এই শপথে সন্তুষ্ট হয়ে সূরা ফাতহের ১৮ নম্বর আয়াত নাজিল করেন। (মুনাফিক জাদ বিন কায়েস ব্যতীত সকল সাহাবি এই শপথ নেন)।

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান দফাসমূহ:

কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর এসে দীর্ঘ আলোচনার পর একটি ১০ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে:

১. মুসলিমরা এই বছর উমরাহ না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন। আগামী বছর এসে ৩ দিন অবস্থান করতে পারবেন। সাথে শুধু কোষবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া কোনো যুদ্ধাস্ত্র আনতে পারবেন না।

২. আগামী ১০ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে সব ধরনের যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

৩. আরবের যেকোনো গোত্র চাইলে মুসলমানদের সাথে বা কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।

৪. কুরাইশদের কোনো ব্যক্তি যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া পালিয়ে মদিনায় (মুসলমানদের কাছে) যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু কোনো মুসলিম যদি মদিনা থেকে পালিয়ে মক্কায় আসে, তবে কুরাইশরা তাকে ফেরত দেবে না।

আবু জানদাল (রা.)-এর প্রত্যাবর্তন ও উম্মে সালামা (রা.)-এর প্রজ্ঞা

চুক্তি লেখার সময়ই সুহাইল ইবনে আমরের ছেলে আবু জানদাল (যিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণের কারণে বন্দী ও নির্যাতিত ছিলেন) শিকল পরা অবস্থায় কোনোমতে পালিয়ে হুদায়বিয়ায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী রাসুলুল্লাহ (সা.) অশ্রুসজল চোখে তাকে তাঁর পিতার কাছেই ফেরত দিতে বাধ্য হন।

সন্ধির শর্তগুলো আপাতদৃষ্টিতে অপমানজনক মনে হওয়ায় সাহাবিরা ভীষণ বিষণ্ণ ও মানসিকভাব ভেঙে পড়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের ইহরাম ভেঙে কুরবানী করার নির্দেশ দিলেও কেউ উঠছিলেন না।

তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) এক অনন্য বুদ্ধি দেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, আপনি কারও সাথে কথা না বলে নিজে গিয়ে নিজের পশু কুরবানী করুন এবং মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তা-ই করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে সমস্ত সাহাবি সাথে সাথে নিজেদের পশু কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন করে ফেললেন।

নারীদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম: সন্ধির পর কিছু মুসলিম নারী মক্কা থেকে হুদায়বিয়ায় হিজরত করে আসেন। কুরাইশরা শর্তানুযায়ী তাদের ফেরত চাইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ চুক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে 'পুরুষদের' (رجال) ফেরত দেওয়ার কথা ছিল, নারীদের নয়। আল্লাহ তায়ালাও সূরা মুমতাহিনার ১০ নম্বর আয়াত নাজিল করে নারীদের ফেরত দিতে নিষেধ করেন।

আপাত পরাজয় কিন্তু 'সুস্পষ্ট বিজয়':

মদিনায় ফেরার পথে আল্লাহ তায়ালা সূরা ফাতহের ১ম আয়াত নাজিল করেন: "নিশ্চয়ই আমি আপনার জন্য এক সুস্পষ্ট বিজয় ফয়সালা করে দিয়েছি।" (সূরা ফাতহ, ৪৮:১)। এই সন্ধির ফলেই আরবে শান্তি ফিরে আসে, যার ফলে পরবর্তী ২ বছরে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ঘটে এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের মতো বীর যোদ্ধারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. খায়বারের যুদ্ধ (৭ম হিজরী): কারণ ও ফলাফল

যুদ্ধের প্রধান কারণসমূহ

১. খায়বার ছিল মদিনা থেকে বহিষ্কৃত ইহুদিদের প্রধান ঘাঁটি এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

২. খায়বারের ইহুদিরাই আরবের সমস্ত কাফের গোত্রকে একত্রিত করে 'খন্দকের যুদ্ধ' বা আহযাবের যুদ্ধ বাধাতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল।

৩. মদিনার স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য খায়বারের এই বিপজ্জনক দুর্গের অবসান ঘটানো অত্যন্ত জরুরি ছিল।

খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র

হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পর ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসের শেষভাগে রাসুলুল্লাহ (সা.) ১৪০০ জন সাহাবি নিয়ে খায়বারের দিকে রওনা হন।

এদিকে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই গোপনে খায়বারের ইহুদিদের কাছে মুসলিমদের এই অভিযানের খবর পাঠায় এবং তাদের অভয় দিয়ে বলে যে, মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম, তারা যেন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) মূল রাস্তা পরিহার করে উত্তর দিক দিয়ে (সিরিয়ার পথ ধরে) খায়বারে প্রবেশ করেন, যাতে ইহুদিরা উত্তর দিকে পালাতে না পারে এবং তাদের মিত্র 'বনু গাতফান' গোত্র যেন তাদের সাহায্য করতে না পারে।

আমির বিন আকওয়া (রা.)-এর কবিতা ও শাহাদাত

পথিমধ্যে সাহাবি আমির বিন আকওয়া (রা.) উটের পিঠ থেকে নেমে সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তা শুনে দোয়া করেন, "আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।" সাহাবিরা জানতেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যার জন্য এই বিশেষ দোয়া করতেন, তিনি সাধারণত শাহাদাত বরণ করতেন। পরবর্তীতে এই যুদ্ধে আমির (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

খায়বারের দুর্গসমূহ ও চূড়ান্ত বিজয়

খায়বার অঞ্চলটি মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল, যার অধীনে মোট ৮টি অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গ ছিল:
১. নাতাত ও শাক অঞ্চল
ক. নাঈম দুর্গ, খ. সা'ব বিন মুয়াজ দুর্গ, গ. জুবায়ের দুর্গ, ঘ. উবাই দুর্গ, ঙ. নিযার দুর্গ
২. কাতিবাহ অঞ্চল
চ. কামুস দুর্গ, ছ. ওয়াতীহ দুর্গ, জ. সুলালিম দুর্গ

রাসুলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধের মূল পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করেন। আলীর বীরত্বে একে একে প্রথম অঞ্চলের অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গগুলো মুসলিমরা জয় করেন। দ্বিতীয় অঞ্চলের দুর্গগুলো মুসলিমদের তীব্র আক্রমণ দেখে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে।

খায়বারের সন্ধি ও গণিমত বন্টন

ইহুদি নেতা ইবনুল হুকাইক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। শর্ত চূড়ান্ত হয় যে:

ইহুদিদের জীবন রক্ষা করা হবে এবং তারা তাদের পরিবারসহ খায়বার ছেড়ে চলে যাবে।

তাদের সমস্ত সোনা-দানা, অস্ত্র ও সম্পত্তি মুসলিমদের হাতে সমর্পণ করতে হবে।

পরবর্তীতে ইহুদিদের অনুরোধে রাসুলুল্লাহ (সা.) এই শর্তে তাদের খায়বারে থাকার অনুমতি দেন যে, তারা এই জমিতে চাষাবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের ঠিক অর্ধেক (৫০%) প্রতি বছর মদিনার মুসলিমদের দিতে হবে।

গণিমতের প্রাচুর্য: খায়বার থেকে এত বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল অর্জিত হয়েছিল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন— "খায়বার বিজয়ের আগ পর্যন্ত আমরা কখনো পেট পুরে খেতে পারিনি।" গণিমতের মাল মোট ৩৬০০ অংশে ভাগ করা হয়েছিল, যার অর্ধেক সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং বাকি অর্ধেক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জরুরি তহবিলের জন্য জমা রাখা হয়।

জাফর (রা.)-এর প্রত্যাবর্তন

খায়বার বিজয়ের ঠিক পরপরই হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) আবিসিনিয়া (হাবশা) থেকে হিজরত করে সপরিবারে মদিনায় ফিরে আসেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুম্বন করেন এবং আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন:

"আল্লাহর কসম, আমি আজ কোনটির জন্য বেশি আনন্দিত তা জানি না— খায়বার বিজয়ের জন্য, নাকি জাফরের ফিরে আসার জন্য!"

পর্ব ১: মুতাহর যুদ্ধ (প্রেক্ষাপট, ফলাফল ও শিক্ষা)

১. মুতাহ যুদ্ধের কারণ

দূতের মর্যাদা লঙ্ঘন: রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত হারেস বিন উমাইর আযদী (রা.)-কে একটি দাওয়াতী পত্র দিয়ে বুসরার (শাম অঞ্চলের) শাসকের নিকট পাঠান। পথিমধ্যে তৎকালীন রোমান সম্রাটের অধীনস্থ গাসসানীয় গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দূতকে বন্দী করে এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে বেঁধে হত্যা করে।

যুদ্ধ ঘোষণা: তৎকালীন আন্তর্জাতিক নিয়মে রাষ্ট্রদূত বা বার্তাবাহকদের হত্যা করা ছিল জঘন্যতম অপরাধ এবং সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁর পত্রবাহকের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পেলেন, তখন তিনি মদিনায় ৩,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। খন্দকের যুদ্ধ বাদে এর আগে অন্য কোনো অভিযানে মুসলিমদের এত বড় বাহিনী গঠিত হয়নি।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যতিক্রমী অসিয়ত (ওহী)

এই অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করার সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবার একটি ব্যতিক্রমী ধারাবাহিক অসিয়ত করেন। তিনি বলেন:

"যদি যায়েদ (বিন হারেসা) শহীদ হন, তবে জাফর (বিন আবু তালিব) সেনাপতি হবেন। জাফর শহীদ হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবেন। আর আব্দুল্লাহও যদি নিহত হন, তবে মুসলিমরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একজনকে আমীর (প্রধান) বানিয়ে নেবে।"

সেনাপতিদের এই দীর্ঘ তালিকার কারণে এই যুদ্ধকে 'জাইশুল উমারা' বা 'আমীরদের বাহিনীর যুদ্ধ' বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) সেনাদলের জন্য একটি সাদা পতাকা তৈরি করে হযরত যায়েদের হাতে দেন।

যুদ্ধের ময়দানে অনুসরণীয় মানবিক নীতিমালা

বাহিনী রওনা হওয়ার প্রাক্কালে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম সেনাদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশনা বা উপদেশের বাণী দেন:

যে স্থানে হারেস বিন উমাইর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে প্রথমে অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। তারা গ্রহণ করলে উত্তম, অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। তবে সাবধান! বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, আমানতের খেয়ানত করবে না, কোনো শিশু, নারী, বৃদ্ধ এবং উপাসনালয়ে অবস্থানরত পুরোহিতদের হত্যা করবে না। খেঁজুর গাছ বা অন্য কোনো ফলবান বৃক্ষ কাটবে না এবং কোনো বাড়ি-ঘর বা দালানকোঠা ধ্বংস করবে না।

৩. মুসলিম বাহিনীর পরামর্শ সভা

মুসলিম বাহিনী বর্তমান জর্ডানের 'মাআন' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। সেখানে গোয়েন্দা সূত্রে তারা জানতে পারেন যে, রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস (কায়সার) বালকা অঞ্চলের 'মায়াব' নামক স্থানে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) নিয়মিত রোমান সেনা

নিয়ে অবস্থান করছেন। তদুপরি, শুরাহবিল বিন আমরের নেতৃত্বে আরও ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) স্থানীয় খ্রিস্টান আরব সেনা তাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

মাত্র ৩,০০০ সৈন্য নিয়ে এই ২ লক্ষের বিশাল ও যুদ্ধপ্রিয় বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া যাবে কি না—তা নিয়ে সাহাবিরা দ্বিধায় পড়েন। অনেকে মদিনায় চিঠি পাঠিয়ে পরামর্শ বা অতিরিক্ত সৈন্য চাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু এই কঠিন মুহূর্তে বিখ্যাত কবি ও সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) বীরত্বপূর্ণ এক ভাষণ দেন:

"আল্লাহর কসম! যে ব্যাপারটিকে আপনারা এখন ভয় পাচ্ছেন, সেটিই তো মূলত শাহাদাত—যার খোঁজে আপনারা মদিনা থেকে বের হয়েছেন। আমরা সংখ্যার জোরে যুদ্ধ করি না, লড়ি ঈমানের শক্তিতে। অতএব এগিয়ে চলুন!"

তাঁর এই বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাহিনী এগিয়ে যাওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়।

৪. যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব ও শাহাদাত

মুসলিম বাহিনী বালকার 'মাশারিফ' নামক গ্রামে রোমান বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং পরে সুবিধাজনক স্থান 'মুতাহ' নামক উপত্যকায় অবস্থান নেয়। এরপর শুরু হয় ইতিহাসের অন্যতম অসম যুদ্ধ:

হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.): রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরমপ্রিয় এই সাহাবি বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে প্রথমে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.): তাঁর শাহাদাতের পর হযরত জাফর ইসলামের পতাকা হাতে তুলে নেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর দুই হাত কেটে ফেলা হলেও তিনি বুক দিয়ে ইসলামের পতাকাকে জড়িয়ে রাখেন। অবশেষে তিনিও শহীদ হন (আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে দুটি ডানা দিয়েছেন, তাই তিনি জাফর তাইয়্যার নামে পরিচিত)।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.): এরপর অসিয়ত অনুযায়ী আব্দুল্লাহ পতাকা তুলে নিয়ে শত্রুর ব্যূহের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

৫. খালিদ বিন ওয়ালিদের রণকৌশল ও সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন

তিন জন সেনাপতিই পর পর শহীদ হলে মুসলিম বাহিনী সাময়িক নেতৃত্বহীনতায় পড়ে। তখন বনু আজলান গোত্রের সাহাবি সাবিত বিন আরকাম (রা.) ইসলামের পতাকাটি তুলে ধরে উচ্চস্বরে ডাক দেন। সাহাবিরা সর্বসম্মতিক্রমে রণকুশলী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে সেনাপতি মনোনীত করেন।

অলৌকিক দৃশ্য ও মদিনায় বার্তা

মদিনায় বসেই রাসুলুল্লাহ (সা.) ওহীর মাধ্যমে মুতাহর যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত দৃশ্য সরাসরি দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি সাহাবিদের ডেকে অশ্রুসজল চোখে পর পর তিন জনের শাহাদাতের খবর দেন। এরপর বলেন:

"এখন আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্য থেকে একটি তলোয়ার (সাইফুল্লাহ) ইসলামের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে এবং আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলিমদের বিজয়/নিরাপত্তা দান করেছেন।"

প্রিয় তিন সাহাবির শাহাদাতের শোকে রাসুলুল্লাহ (সা.) টানা তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন, নিজের ঘরেও যেতে পারেননি।

খালিদ (রা.)-এর ঐতিহাসিক রণকৌশল

রোমানরা মরুভূমির যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) রাতে এক অভূতপূর্ব কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর ডানদিকের সৈন্যদের বাঁদিকে, বাঁদিকের সৈন্যদের ডানদিকে এবং পেছনের সৈন্যদের সামনে নিয়ে আসেন। সকালে নতুন সৈন্যদল ও তাদের পায়ের ধুলো দেখে রোমানরা ভাবল মদিনা

থেকে মুসলিমদের বিশাল সাহায্যকারী দল এসেছে। খালিদ (রা.) কৌশলগতভাবে ধীরে ধীরে বাহিনীকে পেছনে সরাতে থাকেন। রোমানরা ভাবল এটি মুসলিমদের কোনো মরণফাঁদ বা ফাঁদ (Ambush), তাই তারা আর পিছু ধাওয়া না করে নিজেদের দেশে ফিরে যায়।

মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত বীরত্ব ও সম্মানের সাথে মদিনায় ফিরে আসে। মদিনায় প্রবেশের সময় কিছু আবেগপ্রবণ লোক তাদের দিকে মাটি ছুড়ে 'পলাতক বাহিনী' বলে ডাকলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের থামিয়ে দিয়ে বলেন:

"তারা পলাতক নয়; বরং ইনশাআল্লাহ তারা আল্লাহর রাস্তায় পুনরায় আক্রমণকারী (কাররার) হিসেবে প্রমাণিত হবে।"

৬. মুতাহ যুদ্ধের বিশেষত্ব ও শিক্ষা

বিশেষত্ব: এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে সরাসরি অংশ না নিলেও এর গুরুত্বের কারণে এটিকে 'গাজওয়া' বলা হয়। এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) একসাথে তিন জন সেনাপতি মনোনীত করেছিলেন।

নেতৃত্বের শিক্ষা: ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়। যে ব্যক্তি নিজে থেকে পদের লোভ করে, ইসলাম তাকে দায়িত্ব দিতে নিরুৎসাহিত করে।

সশরীরে জিহাদের গুরুত্ব: বর্তমান যুগে অনেকে মুখের বা কলমের কথাকে ঢাল বানিয়ে সশরীরে আল্লাহর রাস্তায় জানমালের ত্যাগের জিহাদকে অস্বীকার করতে চান। কিন্তু মুতাহর যুদ্ধ প্রমাণ করে যে, সাহাবিদের মধ্যে যারা মদিনার সবচেয়ে বড় আলেম বা কবি ছিলেন (যেমন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা), তারাও ময়দানের ডাক এলে ঘরে বসে থাকেননি।

বিধবা ও নারীদের পুনর্বাসন: ইসলাম স্বামীহারা বা বিধবা নারীদের মর্যাদার সাথে সমাজে পুনর্বাসিত করতে উৎসাহিত করে। হযরত জাফরের শাহাদাতের পর তাঁর স্ত্রী

আসমা বিনতে উমাইশ (রা.)-কে প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) বিবাহ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা.) তাঁকে বিবাহ করেন। এভাবে আসমা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয় তিন জন মহান সাহাবীর স্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করেন।

পর্ব ২: মক্কা বিজয় (প্রেক্ষাপট, অভিযান ও সাধারণ ক্ষমা)

১. মক্কা বিজয়ের কারণ (চুক্তি ভঙ্গ)

হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল— আরবের যেকোনো গোত্র চাইলে মুসলিমদের সাথে বা কুরাইশদের সাথে মিত্রতা চুক্তি করতে পারবে। এই সুযোগে বনু খুযাআ গোত্র মুসলিমদের সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে জোত বাঁধে। অষ্টম হিজরীর শাবান মাসে বনু বকর গোত্রের নওফেল ইবনে মুয়াবিয়া একদল সৈন্য নিয়ে রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে বনু খুযাআ গোত্রের ওপর আক্রমণ করে বসে।

সবচেয়ে জঘন্য বিষয় ছিল, কুরাইশরা হুদায়বিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করে গোপনে বনু বকর গোত্রকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে, এমনকি কুরাইশদের কয়েকজন যোদ্ধা ছদ্মবেশে এই হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেয়। বনু খুযাআর অনেকে কাবা ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিলেও সেখানে তাদের হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর আমর বিন সালিম খুযায়ী মদিনায় ছুটে এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে সাহায্য চান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: "হে আমর! তোমাকে সাহায্য করা হবে।"

২. কুরাইশদের আতঙ্ক ও আবু সুফিয়ানের মদিনা সফর

চুক্তি ভঙ্গ করার পর কুরাইশরা বুঝতে পারে যে তারা মস্ত বড় ভুল করেছে এবং মুসলিমরা এর প্রতিশোধ নেবে। আতঙ্কিত হয়ে তারা আবু সুফিয়ানকে চুক্তি নবায়ন করার জন্য মদিনায় পাঠায়।

কন্যা উম্মে হাবিবাহর ঘরে: আবু সুফিয়ান মদিনায় পৌঁছে তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবাহ (রা.)-এর ঘরে যান। তিনি যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিছানায় বসতে গেলেন, উম্মে হাবিবাহ (রা.) বিছানাটি দ্রুত গুটিয়ে নেন। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে কন্যা স্পষ্ট বলেন: "এটি আল্লাহর রাসুলের পবিত্র বিছানা, আর আপনি একজন অপবিত্র মুশরিক; তাই এই বিছানায় আপনি বসতে পারেন না।"

ব্যর্থ অনুনয়: এরপর আবু সুফিয়ান রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলেও রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো উত্তর দেননি। আবু বকর ও আলী (রা.)-এর কাছে সুপারিশ চাইলে তারাও সাফ জানিয়ে দেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু করা সম্ভব নয়। নিরুপায় হয়ে আবু সুফিয়ান মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে নিজের পক্ষ থেকে শান্তি বজায় রাখার একতরফা ঘোষণা দিয়ে মক্কায় ফিরে যান।

৩. মক্কা অভিযানের গোপন প্রস্তুতি ও হাতিব (রা.)-এর চিঠি

রাসুলুল্লাহ (সা.) ৮ম হিজরীর রমজান মাসে মক্কা অভিযানের সম্পূর্ণ গোপন প্রস্তুতি নেন। এই গোপনীয়তার মাঝেও মুহাজির সাহাবি হাতেব বিন আবী বালতাআ (রা.) মক্কার কুরাইশদের সতর্ক করে একটি গোপন চিঠি এক মহিলার মাধ্যমে মক্কায় পাঠাচ্ছিলেন, যাতে মক্কায় থাকা তাঁর অসহায় পরিবার কুরাইশদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়।

আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বিষয়টি জানিয়ে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আলী, যুবায়ের ও মিকদাদ (রা.)-কে পাঠান। তাঁরা 'রওজাতু খাক' নামক স্থানে সেই মহিলাকে ধরে তাঁর চুলের খোঁপা থেকে চিঠিটি উদ্ধার করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিচারিক আদর্শ: চিঠিসহ হাতেব (রা.)-কে হাজির করা হলে হযরত উমর (রা.) তাঁর শিরশ্ছেদের অনুমতি চান। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) একজন আদর্শ বিচারকের মতো হাতেবের অতীত অবদান (তিনি বদরের যুদ্ধ জয়ী সাহাবি ছিলেন) এবং তাঁর সরল স্বীকারোক্তি বিবেচনা করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

৪. মাররুয যাহরানে ১০,০০০ অগ্নিকুণ্ড ও আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

১০,০০০ সাহাবির বিশাল বাহিনী নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কার প্রবেশদ্বার মাররুয যাহরান উপত্যকায় পৌঁছান। রাতের বেলা শত্রুর মনে ভয় ধরাতে এবং নিজেদের প্রকৃত সংখ্যা আড়াল করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দেন যেন সবাই পৃথক পৃথক স্থানে আগুন জ্বালায়। ফলে রাতে ১০,০০০ স্থানে আগুন জ্বলে ওঠে, যা দেখে কুরাইশরা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এসে আবু সুফিয়ান মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। হযরত আব্বাস (রা.) তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নিয়ে আসেন। সেখানে ইসলামের সত্যতা ও মুসলিমদের মহত্ত্ব দেখে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান একটু সম্মানপ্রিয় মানুষ, তাকে বিশেষ কোনো মর্যাদা দিন।" রাসুলুল্লাহ (সা.) ঐতিহাসিক ঘোষণা দিলেন:

"যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ, যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপদ এবং যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।"

৫. বীরের বেশে মক্কায় প্রবেশ ও মূর্তির পতন

৮ম হিজরীর ১৭ বা ২০ রমজান মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) অহংকার না করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নিচু করে তাঁর 'কাসওয়া' উটের পিঠে চড়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন।

মূর্তি ভাঙার অলৌকিক দৃশ্য: কাবা ঘরের চারপাশে এবং ছাদের ওপর তখন ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাতের ধনুক বা ছড়ি দিয়ে মূর্তিগুলোর গায়ে আঘাত করতে লাগলেন আর সেগুলো ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল। এ সময় তিনি কোরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থাত: "সত্য এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা ইসরা: ৮১)

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থাত: "সত্য এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা ইসরা: ৮১)

তাওয়াফ শেষে তিনি উসমান বিন তালহার কাছ থেকে কাবার চাবি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং জমজমের পানি দিয়ে কাবার ভেতরের সমস্ত মূর্তির ছবি ও অপবিত্রতা পরিষ্কার করেন। এরপর কাবার ছাদে দাঁড়িয়ে হযরত বিলাল (রা.) উচ্চস্বরে বিজয়ের আযান দেন।

৬. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও কালো তালিকাভুক্ত অপরাধী

কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের জিজ্ঞেস করলেন, "হে কুরাইশরা! তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার আশা করো?" তারা বলল, "আপনি দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র।" রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে বললেন:

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত ও স্বাধীন!"

কালো তালিকাভুক্ত অপরাধীদের বিচার

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলেও ইসলামের অতি জঘন্য শত্রু এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকারী ৯ থেকে ১৭ জন ব্যক্তির একটি 'কালো তালিকা' (Blacklist) তৈরি করা হয়েছিল। নির্দেশ ছিল— এদের যদি কাবার পর্দাও আঁকড়ে ধরে থাকতে দেখা যায়,

তবুও যেন ছেড়ে দেওয়া না হয়। তবে এদের মধ্যেও অনেকেই পরে অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করায় ক্ষমা পান:

১. আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল: (মৃত্যুদণ্ড কার্যকর) সে ইসলাম গ্রহণ করার পর একজন মুসলিমকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল এবং দুই দাসী (ফারতানা ও আরনাব)-কে দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে কুৎসামূলক গান গাওয়াত।

২. মিকইয়াস বিন সুবাবাহ: (can নিহত/মৃত্যুদণ্ড কার্যকর) মুসলিম হওয়ার পর কিসাস ছাড়াই এক আনসারীকে হত্যা করে মুরতাদ হয়েছিল।

৩. হুয়াইরিস বিন নুকাইয: (হযরত আলী কর্তৃক নিহত) সে মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিত।

৪. হিলান বা ইকরামা বিন আবু জাহেল: (ক্ষমা ও ইসলাম গ্রহণ) সমুদ্রপথে পালিয়ে যাওয়ার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে আল্লাহর একত্ববাদ উপলব্ধি করে ফিরে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ: (হযরত উসমানের সুপারিশে ক্ষমা ও ইসলাম গ্রহণ)।

৬. হাব্বার বিন আসওয়াদ: (ক্ষমা ও ইসলাম গ্রহণ) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.) মদিনায় হিজরতের সময় ইনি উটের পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় গর্ভপাত হয়ে যয়নব গুরুতর আহত হয়েছিলেন। পরে তিনি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৭. হিন্দা বিনতে উতবাহ: (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, ওহুদের যুদ্ধে হযরত হামযার কলিজা চিবিয়েছিল, পরে ইসলাম গ্রহণ ও ক্ষমা লাভ)।

৮. ওয়াহশী বিন হারব: (হযরত হামযার হত্যাকারী, পরে ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষমা পান এবং পরবর্তীতে ভণ্ড নবী মুসায়লিমাকে হত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেন)।

৯. কাব বিন জুহাইর: (বিখ্যাত কবি, রাসুলুল্লাহর নামে কুৎসা রটাতেন, পরে কাবার সামনে এসে বিখ্যাত কাসীদা 'বানাত সুয়াদ' পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ তাকে নিজের চাদর উপহার দেন)।

৭. মদিনায় ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ও মক্কার নতুন মর্যদা

মক্কা বিজয়ের পর আনসার সাহাবিদের মনে সংশয় জেগেছিল যে রাসুলুল্লাহ (সা.) হয়তো তাঁর নিজের জন্মভূমি মক্কাতেই স্থায়ীভাবে থেকে যাবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের এই আশঙ্কা দূর করে আবেগঘন কণ্ঠে বলেন:

"কখনোই নয়! তোমাদের জীবনই আমার জীবন, তোমাদের মৃত্যুই আমার মৃত্যু। আমি মদিনাতেই ফিরে যাব।"

বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কাবাসীদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি স্পষ্ট করেন যে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ মক্কাকে পবিত্র ও হারাম ঘোষণা করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন কেবল তাঁর জন্য কিছু সময়ের জন্য এখানে রক্তপাত বৈধ করা হয়েছিল (কুরাইশদের অবাধ্যতার কারণে), এখন এর পবিত্রতা আগের মতোই ফিরে এসেছে। কেয়ামত পর্যন্ত এখানে কোনো রক্তপাত বা গাছপালা কাটা নিষিদ্ধ।

৮. মক্কা বিজয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

ঈমানের শক্তিই আসল: কোনো মুমিনের অন্তরে যদি ঈমান খাঁটি থাকে, তবে সাময়িক কোনো ভুল বা গোনাহের (যেমন হাতেব রা.-এর চিঠি পাঠানো) কারণে সে ধ্বংস হয়ে যায় না, বরং অন্তরের আলো তাকে দ্রুত তাওবায় উদ্বুদ্ধ করে।

মানুষের অতীত মূল্যায়ন: কারো একটি ভুলের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে, তার অতীত জীবনের ভালো কর্ম ও অবদানকে (যেমন হাতেব রা.-এর বদর যুদ্ধের অবদান) বিবেচনায় নিতে হবে।

ক্ষমা ও মহত্ত্বের আদর্শ: ইসলাম শক্তির দাপট দেখানোর ধর্ম নয়। চরম শত্রুকেও বিজয়ের মুহূর্তে ক্ষমা করে দেওয়ার যে অনন্য নজির রাসুলুল্লাহ (সা.) স্থাপন করেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

মূর্তিপূজার অবসান: মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) খালেদ বিন ওয়ালিদকে 'উযযা' মূর্তি, আমর ইবনুল আসকে 'সুওয়া' মূর্তি এবং সাদ বিন যায়েদকে 'মানাত' মূর্তি ধ্বংসের জন্য পাঠিয়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে শিরকমুক্ত করেন।

ধৈর্যের ফল মধুর: যে মক্কাবাসীরা মুসলিমদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, দীর্ঘ ৮ বছরের অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও তাওয়াক্কুলের পর আল্লাহ মুসলিমদের সেই মক্কারই একচ্ছত্র বিজয়ী হিসেবে সম্মানিত করেন।

তাবুক যুদ্ধ: প্রেক্ষাপট, অভিযান ও ফলাফল

১. যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও কারণ

- **মক্কা বিজয় পরবর্তী মদিনা:** মক্কা বিজয়ের দীর্ঘ সফর শেষে আল্লাহর রাসুল (সা.) মদিনায় ফিরে কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় মদিনায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল আসতে শুরু করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) দ্বীনের দাঈদের বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াত নিয়ে পাঠান এবং জাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী নির্ধারণ করেন। কোনো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো, কারণ নওমুসলিমদের জন্য ইসলামী আকীদা ও আমল শেখা অত্যন্ত জরুরি ছিল।
- **৯ম হিজরীর তৎপরতা:** ৯ম হিজরীর মুহাররম মাস থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন গোত্রের কাছে সাদাকা ও জাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সাহাবিদের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন।

- **রোমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি:** মুতাহর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর এক বছর পার হতে না হতেই রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস (কায়সার) রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসী এবং তাদের অধীনস্থ খ্রিষ্টান আরব গোত্রগুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য একত্রিত করতে শুরু করেন।
- **মদিনায় আতঙ্কের শিহরন:** সিরিয়া থেকে আসা তেলবাহী কাফেলার মাধ্যমে মদিনায় খবর পৌঁছায় যে, রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস **৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)** সুসজ্জিত ও শক্তিশালী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করেছেন। এই খবর শোনার পর মদিনার মুসলিম সমাজে তীব্র আতঙ্কের শিহরন বয়ে যায়।

২. মুনাফিকদের ভূমিকা ও 'মসজিদে যেরার' নির্মাণ

মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোপনে কুচক্র ও ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা মদিনায় একটি আড্ডাখানা তৈরি করে। তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্য ঢেকে রাখার জন্য তারা কৌশলে সেটিকে একটি মসজিদের রূপ দেয় এবং নাম রাখে **'মসজিদে যেরার'** (ক্ষতিকর মসজিদ)।

- **কৌশল ও ষড়যন্ত্র:** তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সেখানে গিয়ে সালাত আদায়ের অনুরোধ জানায়, যাতে মুসলিমরা তাদের গভীর ষড়যন্ত্র টের না পায় এবং অন্য কারও মনে যেন মুনাফিকদের প্রতি কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।
- **রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত:** রাসুলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে সেখানে সালাত আদায়ের বিষয়টি যুদ্ধ থেকে ফেরা পর্যন্ত স্থগিত রাখেন। কিন্তু যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফেরার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা ওহীর আয়াত নাজিল করে মুনাফিকদের এই গোপন ষড়যন্ত্র উন্মোচন করে দেন। ফলে রাসুল (সা.) মদিনায় ফিরে সেই ছদ্মবেশী আড্ডাখানাটি (মসজিদ) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার আদেশ দেন।

৩. যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতি

এই সময়টি মুসলিমদের জন্য ছিল এক চরম পরীক্ষার মুহূর্ত:

- **দুর্ভিক্ষ ও বাহনের অভাব:** তীব্র গরমের পাশাপাশি তখন মদিনায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। ফলে যাতায়াতের জন্য বাহন (উট/ঘোড়া) ছিল অত্যন্ত সীমিত।
- **ফল পাকার মরশুম:** মদিনার খেজুর বাগানের ফলগুলো কেবল পাকতে শুরু করেছিল। তীব্র গরমে ফল সংগ্রহ করা এবং গাছের ছায়ায় অবস্থান করাই ছিল মানুষের কাছে সবচেয়ে আরামদায়ক।

- **দীর্ঘ ও দুর্গম পথ:** মদিনা থেকে তাবুকের দূরত্ব ছিল প্রায় **৭৭৮ মাইল (১২৫০ কিলোমিটার)**। এত বিশাল দূরত্ব এবং তীব্র গরমের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল।

৪. মুসলিম বাহিনীকে রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ

রাসুলুল্লাহ (সা.) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই মুহূর্তে যদি রোমানদের বিরুদ্ধে অগ্রিম পদক্ষেপ না নেওয়া হয় এবং রোমানরা যদি মদিনার দ্বারপ্রান্তে চলে আসে, তবে তা ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি হবে। পেছনে মুনাফিক শত্রু আর সামনে রোমান বাহিনী—উভয় মিলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পারে।

তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) সিদ্ধান্ত নেন যে, রোমানদের মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া যাবে না; বরং তাদের সীমানাতেই গিয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করতে হবে। তিনি সাহাবিদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং মক্কার চারপাশের বিভিন্ন মিত্র গোত্রগুলোর কাছেও তাবুক অভিযানের বার্তা পাঠান। এই সময়ে সাহাবিদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে এবং বেশি বেশি অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে **সূরা তাওবার** একটি বড় অংশ নাজিল হয়।

৫. মুসলিমদের অভূতপূর্ব যুদ্ধ প্রস্তুতি (প্রতিযোগিতা)

রাসুল (সা.)-এর ঘোষণার সাথে সাথে বিভিন্ন গোত্র মদিনায় সমবেত হতে শুরু করে। একমাত্র মুনাফিকরা ব্যতীত কোনো নিষ্ঠাবান মুসলিমের মনে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার চিন্তা ছিল না (ব্যতিক্রম কেবল তিন জন সাহাবি, যাদের কথা পরে আসছে)।

- **দরিদ্র সাহাবিদের কান্না:** কিছু গরিব ও অসহায় সাহাবি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে আবেদন করেন যে, তাদের যদি বাহনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তবে তারা যুদ্ধে যাবেন। কিন্তু রাসুল (সা.) বাহন দিতে না পেরে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলে তারা অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। এদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ **সূরা তাওবার ৯২ নম্বর আয়াত** নাজিল করেন।
- **সাহাবিদের দান ও ত্যাগ:** যুদ্ধের তহবিলে দান করার জন্য সাহাবিদের মাঝে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।
    - **হযরত আবু বকর (রা.):** তাঁর ঘরের সমস্ত সম্পদ (শতভাগ) নিয়ে এসে রাসুল (সা.)-এর হাতে তুলে দেন।

- **হযরত উমর (রা.):** তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করেন।
- **হযরত উসমান (রা.):** একাই ৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া এবং প্রচুর সোনা-রুপা দান করে পুরো বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ খরচের দায়িত্ব নেন।
- **অন্যান্য সাহাবি ও নারী সমাজ:** সাধারণ সাহাবিরা যা পেরেছেন (এমনকি এক-দুই মুঠো খেজুর) তা-ই নিয়ে এসেছেন। মদিনার নারীরা তাঁদের গলার মালা, হাতের চুড়ি, কানের রিং ও আঙটিসহ সমস্ত অলংকার রাসুল (সা.)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দেন।

৬. মুনাফিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপপ্রচার

মুনাফিকরা নিজেরা তো যুদ্ধে অংশ নেয়ইনি, বরং যারা অকাতরে দান করছিলেন তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে। যারা বেশি দান করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে তারা বলল—এরা "লোক দেখানোর জন্য" দান করছে। আর যারা সামান্য খেজুর নিয়ে এসেছিলেন, তাদের দেখে উপহাস করে বলল, *"এই এক-দুই মুঠো খেজুর দিয়ে এরা রোমান সাম্রাজ্য জয় করার স্বপ্ন দেখছে!"* তাদের এই আচরণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাজিল করেন:

"যারা দোষারোপ করে সেসব মুমিনদের যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের, যাদের নিজেদের পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই নেই; অতঃপর তারা তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।" (সূরা তাওবা, ৯:৭৯)

জাদ বিন কায়েসের অজুহাত

তীব্র গরমের ভয় দেখিয়ে তারা মুসলিমদের বলত, *"এই গরমে তোমরা যুদ্ধযাত্রায় বের হয়ো না।"* রাসুল (সা.) যখন মুনাফিক জাদ বিন কায়েসকে জিজ্ঞেস করলেন, *"তুমি কি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে?"* সে উত্তর দিল, *"হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে অনুমতি দিন, ফিতনায় ফেলবেন না। আল্লাহর কসম! আমার গোত্রের সবাই জানে যে আমি নারী আসক্ত। রোমান নারীদের দেখলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না।"* রাসুল (সা.) তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিলে আল্লাহ আয়াত নাজিল করেন:

"আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখো, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।" (সূরা তাওবা, ৯:৪৯)

রাসুলুল্লাহ (সা.) জানতে পারেন যে, 'সুয়াইলিম' নামক এক ইহুদির ঘরে বসে কিছু মুনাফিক মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই বাড়িটি পুড়িয়ে বা ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে।

৭. তাবুকের পথে ইসলামী সেনাবাহিনী

৯ম হিজরীর রজব মাসে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মদিনার প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং নিজের পরিবারের দেখাশোনার জন্য তিনি **হযরত আলী (রা.)**-কে মদিনায় রেখে যান। আলী (রা.) যুদ্ধে যেতে না পেরে মন খারাপ করলে রাসুল (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ঐতিহাসিক বাণীটি বলেন:

"তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার সাথে তোমার সম্পর্ক তেমন, যেমন ছিল মূসার সাথে হারূনের? তবে জেনে রেখো, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।"

'জাইশুল উসরাহ' বা কষ্টকর বাহিনী

৩০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী হলেও বাহন ও খাদ্যের তীব্র অভাব ছিল। প্রতি ১৮ জন সৈন্যের জন্য মাত্র ১টি উট ছিল, যাতে তারা পর্যায়ক্রমে সওয়ার হতেন। খাবারের অভাবে সাহাবিরা গাছের পাতা খেতেন, যার ফলে তাদের ঠোঁট ও মুখ ফুলে গিয়েছিল। পানির তীব্র সংকটের কারণে উট জবাই করে তার পাকস্থলীর ভেতরের জমানো পানি ছেঁকে তাদের পান করতে হয়েছিল। এই চরম কষ্টের কারণে এই বাহিনীকে **'জাইশুল উসরাহ'** (কষ্টের বাহিনী) এবং এই অভিযানকে **'গাজওয়াতুল উসরাহ'** বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে এই কঠিন মুহূর্তের কথা স্মরণ করে বলেন:

"আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল..." (সূরা তাওবা, ৯:১১৭)

হিজর (সামুদ জাতির এলাকা) অতিক্রম

যাত্রাপথে মুসলিম বাহিনী প্রাচীন 'সামুদ' জাতির এলাকা 'হিজর' (ওয়াদিউল কুরা) অতিক্রম করার সময় সাহাবিরা ওখানকার কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে আটা খামির করেছিলেন। রাসুল (সা.) তা জানতে পেরে নির্দেশ দেন: *"তোমরা এখানকার পানি পান করো না, ওজুর জন্যও ব্যবহার করো না। এই পানি দিয়ে যে খামির তৈরি করেছ তা পশুদের খাইয়ে দাও, নিজেরা খেয়ো না।"* তিনি কেবল হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনীর পানি পানের কূপটি থেকে পানি নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হওয়া সেই এলাকাটি দ্রুত ও কাঁদতে কাঁদতে পার হওয়ার আদেশ দেন।

পরবর্তীতে পথিমধ্যে তীব্র পানির অভাব দেখা দিলে রাসুল (সা.)-এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা মেঘ পাঠিয়ে প্রচুর বৃষ্টিবর্ষণ করেন, যার ফলে পুরো বাহিনী তৃপ্তিসহকারে পানি পান ও সংরক্ষণ করে।

৮. তাবুকের ময়দানে মুসলিম বাহিনী ও রোমানদের পলায়ন

তাবুকের কাছাকাছি পৌঁছে রাসুল (সা.) 'সানিয়াতুল বিদা' নামক প্রান্তরে সৈন্যবিন্যাস করেন। বাহিনীর সবচেয়ে বড় প্রধান পতাকাটি দেওয়া হয় **হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)**-এর হাতে। আনসারদের প্রতিটি গোত্রকে আলাদা নেতার অধীনে সারিবদ্ধ করা হয় এবং ক্যাম্প পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয় হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-কে।

তাবুকে ক্যাম্প স্থাপনের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের উদ্দেশ্যে একটি অত্যন্ত উদ্দীপনামূলক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণ সাহাবিদের ভেতরের সমস্ত ভয় ও ক্লান্তি দূর করে এক অলৌকিক মানসিক শক্তির জন্ম দেয়।

যুদ্ধের ফলাফল

মুসলিমদের এই ৩০,০০০ বীর সেনার আকস্মিক ও সুশৃঙ্খল আগমনের খবর পেয়ে রোমান বাহিনী এবং তাদের মিত্র খ্রিষ্টান গোত্রগুলো এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, তারা মুসলিমদের মুখোমুখি হওয়ার সাহসই হারিয়ে ফেলে। রোমান সেনারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পালিয়ে যায় এবং তাদের রোম সাম্রাজ্যের সীমানার ভেতরে গুটিয়ে নেয়।

এই অবস্থা দেখে রোমানদের অধীনস্থ সীমান্তবর্তী গোত্রগুলো রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বুঝতে পেরে নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে মুসলিমদের কাছে আসে এবং জিজয়া কর দেওয়ার শর্তে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কোনো রকম রক্তপাত বা মুখোমুখি সংঘর্ষ

ছাড়াই রোম সাম্রাজ্যের দাপট খর্ব হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৯. মদিনায় প্রত্যাবর্তন ও মুনাফিকদের হত্যাচেষ্টা

তাবুকে ২০ দিন অবস্থানের পর সম্পূর্ণ বিজয়ী বেশে মুসলিম বাহিনী মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

- **গিরিপথে রাসুল (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র:** ফেরার পথে এক পাহাড়ি গিরিপথ অতিক্রম করার সময় ১২ জন মুখোশধারী মুনাফিক রাতের অন্ধকারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে উটের পিঠ থেকে ফেলে হত্যা করার এক জঘন্য চেষ্টা চালায়। সেই সময় রাসুল (সা.)-এর সাথে ছিলেন কেবল হযরত আম্মার (রা.) [যিনি উটের লাগাম ধরেছিলেন] এবং হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) [যিনি উট তাড়িয়ে নিচ্ছিলেন]।
- **হুজাইফা (রা.)-এর বীরত্ব:** পেছনে মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে রাসুল (সা.)-এর নির্দেশে হযরত হুজাইফা (রা.) ঢাল হাতে নিয়ে সেই মুখোশধারীদের বাহনগুলোর মুখে প্রচণ্ড আঘাত করতে শুরু করেন। মুসলিমদের সতর্কাবস্থা দেখে মুনাফিকরা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে অন্ধকারে সাধারণ সৈন্যদের সাথে মিশে যায়।
- **'রাজদান' বা গোপনীয়তার রক্ষাকারী:** রাসুল (সা.) ওহীর মাধ্যমে সেই ১২ জন মুনাফিকের নাম ও তাদের বংশ পরিচয় হযরত হুজাইফা (রা.)-কে জানিয়ে দেন এবং বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন। এই কারণে হযরত হুজাইফা (রা.)-কে **'সিররু রাসুল'** বা রাসুলুল্লাহর গোপন রহস্যের রক্ষাকারী বলা হয়। (এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা তাওবার ৭৪ নম্বর আয়াত নাজিল হয়)।

মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে রাসুল (সা.) উহুদ পাহাড় দেখে আবেগপ্লুত হয়ে বলেন, *"এটি সেই পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও একে ভালোবাসি।"* মদিনায় বাহিনীর আগমন সংবাদ পৌঁছালে নারী ও শিশুরা ঘর থেকে বের হয়ে 'কাসিদা' গেয়ে তাঁদের স্বাগত জানায়। রজব মাসে শুরু হওয়া এই ঐতিহাসিক সফরটি রমজান মাসে শেষ হয় (মোট ৫০ দিন সময় লেগেছিল, যার মধ্যে ৩০ দিনই ছিল যাতায়াতে)। এটিই ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের সর্বশেষ সশরীরে অংশ নেওয়া যুদ্ধ অভিযান।

১০. পেছনে থেকে যাওয়া তিন জন নিষ্ঠাবান সাহাবীর তাওবা

তাবুক যুদ্ধ ছিল মূলত খাঁটি মুমিন ও মুনাফিকদের আলাদা করার এক মহাপ্রতিযোগিতা। তবে মদিনার তিন জন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী সাহাবি—**কা'ব বিন মালিক, মুরারা বিন রাবি' এবং হিলাল বিন উমাইয়া (রা.)**—কোনো বৈধ কারণ বা মুনাফিকি ছাড়াই কেবল অলসতাবশত এই যুদ্ধে যাওয়া থেকে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন।

- **সামাজিক বয়কট:** রাসুল (সা.) মদিনায় ফেরার পর তাঁরা কোনো মিথ্যা অজুহাত না দেখিয়ে অকপটে নিজেদের ভুলের কথা স্বীকার করেন। ফলশ্রুতিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের সাথে মদিনার সমস্ত মুসলিমের কথাবার্তা ও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধের (সামাজিক বয়কট) নির্দেশ দেন।
- **৫০ দিনের কঠিন পরীক্ষা:** দীর্ঘ ৫০ দিন পর্যন্ত এই বয়কট জারি থাকে, যা তাঁদের জন্য পৃথিবীর বুক সংকীর্ণ করে তুলেছিল। অবশেষে তাঁদের চরম অনুতপ্ততা ও খাঁটি তাওবার কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁদের ক্ষমা করে সূরা তাওবার ১১৭-১১৮ নম্বর আয়াত নাজিল করেন।

১১. হযরত আবু বকর (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রথম হজ পালন

৯ম হিজরীর জিলকদ বা জিলহজ মাসে মক্কায় ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী হজ কায়েম করার উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.) **হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)**-কে 'আমীরুল হজ' (হজযাত্রী দলের নেতা) বানিয়ে মক্কায় পাঠান।

এর পরপরই সূরা তাওবার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাজিল হয়, যেখানে মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা ছিল। আরবের নিয়ম অনুযায়ী চুক্তির চুক্তিদাতার পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ এই ঘোষণা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হতো না। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর চাচাতো ভাই **হযরত আলী (রা.)**-কে এই বিশেষ ঘোষণাটি দিয়ে মক্কায় পাঠান।

হজের ময়দানে হযরত আবু বকর এবং আলী (রা.) যৌথভাবে ঘোষণা করে দেন:

"আগামী বছর থেকে কোনো মুশরিক আর হজ করতে পারবে না এবং কোনো ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় কাবা শরিফ তাওয়াফ করতে পারবে না।"

এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকে মূর্তিপূজা ও জাহেলিয়াতের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেওয়া হয় এবং আরব উপদ্বীপ সম্পূর্ণভাবে একক তাওহীদের ছায়াতলে চলে আসে।

অধ্যায় ৮: উম্মুল মুমিনীন (রা.) এবং নবীজি (সা.)-এর পারিবারিক জীবন

৮.১ উম্মুল মুমিনীন (রা.)-গণের পরিচয় ও বিবাহের প্রেক্ষাপট (Introduction to Wives of Prophet)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন: "নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।" (সূরা আল-আহযাব: ০৬)। এই ঘোষণা অনুযায়ী নবীজি (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ মুসলিম উম্মাহর মা তথা 'উম্মুল মুমিনীন'।
'Ar-Raheeq Al-Makhtum'-er বিশদ বিবরণ অনুযায়ী, নবীজি (সা.) তাঁর জীবনে মোট ১১টি বিবাহ করেছিলেন (যার মধ্যে খাদিজা রা. ও যয়নব বিনতে খুযাইমা রা. নবীজির জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন)। ২৫ বছর থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত নবীজি কেবল একজন বয়স্কা নারী হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথেই একপত্নী জীবন যাপন করেন। পরবর্তীতে ৫০ বছর বয়সের পর তিনি যে বিবাহগুলো করেছিলেন, তার পেছনে কোনো শারীরিক কামনা ছিল না; বরং ইসলামের প্রচার, রাজনৈতিক সখ্যতা, গোত্রীয় কোন্দল নিরসন এবং অসহায় বিধবা ও এতিম নারীদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার মতো মহান দ্বীনী ও মানবিক উদ্দেশ্য ছিল।

১. হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.): নবীজির প্রথমা স্ত্রী। তিনি মক্কার সবচেয়ে ধনী ও সম্মানিত নারী ছিলেন। নবীজির সমস্ত সন্তানের জননী (ইব্রাহীম ছাড়া)।

২. হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.): খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর নবীজি এই প্রবীণ বিধবা সাহাবীকে বিয়ে করেন, যাঁর স্বামী হাবশা থেকে ফেরার পর মারা যান।

৩. হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.): উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে একমাত্র কুমারী কনে এবং ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নারী আইনজ্ঞ ও হাদীস বর্ণনাকারী।

৪. হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.): হযরত উমর (রা.)-এর কন্যা। বদর যুদ্ধে তাঁর স্বামী শহীদ হওয়ার পর নবীজি তাঁকে সম্মান দিয়ে বিয়ে করেন।

৫. হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা.): ওহুদ যুদ্ধে তাঁর স্বামী শহীদ হন। গরীব ও মিসকীনদের প্রতি গভীর দয়ার কারণে তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' (মিসকীনদের মাতা) বলা হতো। বিয়ের মাত্র ৩-৪ মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬. হযরত উম্মে সালামাহ (রা.): তাঁর স্বামী আবু সালামাহ উহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে শহীদ হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদূষী ও দূরদর্শী নারী।

৭. হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা.): নবীজির ফুফাতো বোন। আল্লাহর সরাসরি নির্দেশে (কুরআনের ওহী দ্বারা) এই বিয়ে সম্পন্ন হয়, যার মাধ্যমে আরবের পালিত পুত্র প্রথার কুসংস্কার ভাঙা হয়।

৮.হযরত জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস (রা.): বনু মুস্তালিক গোত্রের প্রধানের কন্যা। তিনি বন্দী হওয়ার পর নবীজি তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করলে সাহাবীগণ বনু মুস্তালিক গোত্রের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দেন।

৯. হযরত উম্মে হাবীবা (রা.): আবু সুফিয়ানের কন্যা। হাবশায় তাঁর স্বামী খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে মারা গেলে তিনি চরম বিপদে পড়েন। নবীজি দূর থেকে নাজ্জাশী রাজার মাধ্যমে ওকালতি পাঠিয়ে তাঁকে বিয়ে করে আশ্রয় দেন।

১০. হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রা.): খায়বার বিজয়ের পর ইহুদি বনু নাযীর গোত্রের এই রাজকন্যা ইসলাম গ্রহণ করলে নবীজি তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে বিয়ে করেন এবং তাঁর মুক্তিকেই মোহরানা গণ্য করেন।

১১. হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.): ৭ হিজরীতে উমরাতুল কাযা সম্পাদনের সময় নবীজি এই বিধবা রমণীকে বিয়ে করেন।

৮.২ হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহ ও তাঁর বিশেষ মর্যাদা (Marriage to Aisha)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহ ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যা সীরাত ইবনে হিশামে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

বিবাহের প্রেক্ষাপট ও ওহীর ইশারা: খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর নবীজি (সা.) তীব্র মানসিক কষ্টে ছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ.) একটি রেশমী কাপড়ে হযরত আয়েশার ছবি নিয়ে এসে নবীজিকে বলেন, "ইনি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার স্ত্রী।" নবীজি (সা.) তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকর (রা.)-এর কাছে প্রস্তাব পাঠালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। মক্কায় অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে মাত্র ৫০০ দিরহাম মোহরানায় তাঁদের আকদ (বিবাহ) সম্পন্ন হয় এবং হিজরতের পর মদীনায় হযরত আয়েশা স্বামীর ঘরে (সংসার জীবন) পদার্পণ করেন।

জ্ঞানের প্রদীপ ও হাদীস বর্ণনা: হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত প্রখর মেধার অধিকারী। নবীজির সাথে দাম্পত্য জীবনে তিনি ইসলামের পারিবারিক, বৈবাহিক এবং নারীদের ব্যক্তিগত মাসআলা-মাসায়িল খুব কাছ থেকে শেখার সুযোগ পান। তিনি সর্বমোট ২২১০টি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বড় বড় সাহাবীগণ জটিল কোনো আইনী সমস্যায় পড়লে মদীনায় হযরত আয়েশার শরণাপন্ন হতেন এবং তিনি তার নিখুঁত সমাধান দিতেন।

নবীজির গভীর ভালোবাসা: নবীজি (সা.) হযরত আয়েশাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। একবার আমর ইবনুল আস (রা.) নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে?" নবীজি দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিলেন, "আয়েশা"। (সহীহ বুখারী)। জীবনের শেষ মুহূর্তে নবীজি হযরত আয়েশার কোলেই মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

৮.৩ উম্মুল মুমিনীনদের সাথে নবীজি (সা.)-এর আচরণ ও পারিবারিক আদর্শ (Prophet's Conduct with Wives)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পারিবারিক জীবন ছিল দয়া, ইনসাফ এবং ভালোবাসার এক জীবন্ত রূপ। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম; আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে তোমাদের চেয়ে উত্তম।" (সুনান তিরমিযী)।

পরম ইনসাফ ও সমতা রক্ষা: একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নবীজি (সা.) তাদের বাসস্থান, ভরণপোষণ এবং সান্নিধ্যের ক্ষেত্রে নিখুঁত সমতা রক্ষা করতেন। তিনি প্রতিদিন আসরের পর প্রতিটি স্ত্রীর ঘরে গিয়ে খোঁজখবর নিতেন এবং রাতে কার ঘরে থাকবেন তা পালাক্রমে (বারী) বণ্টন করতেন। এমনকি কোনো সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের মাঝে লটারি (কুরআহ) করতেন, যার নাম উঠত তাকেই সফরে সাথে নিতেন।

রোমান্টিকতা ও আনন্দময় আচরণ: নবীজি স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত খোলামেলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজি তাঁর সাথে মরুভূমির মাঠে দৌড় প্রতিযোগিতা খেলতেন। আয়েশা (রা.) গ্লাসের যে জায়গায় মুখ দিয়ে পানি পান করতেন, নবীজি গ্লাসটি ঘুরিয়ে ঠিক সেই জায়গায় মুখ রেখে পানি পান করতেন। স্ত্রীদের চুলের সিঁথি কেটে দেওয়া, তাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া ছিল নবীজির প্রতিদিনের অভ্যাস।

সহনশীলতা ও ধৈর্য: সাধারণ মানুষের মতো নবীজির ঘরেও মাঝেমধ্যে স্ত্রীদের মধ্যে ঈর্ষা বা মান-অভিমান (গাইরাহ) হতো। কিন্তু নবীজি কখনো রাগ করতেন না বা গায়ে হাত তুলতেন না, বরং মুচকি হেসে পরিস্থিতি শান্ত করতেন। আয়েশা (রা.) একবার রাগের মাথায় অন্য এক স্ত্রীর পাঠানো খাবারের পাত্র ভেঙে ফেললে নবীজি রেগে না গিয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া খাবারগুলো কুড়িয়ে সাহাবাদের বললেন, "তোমাদের মা একটু ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছেন, তোমরা খাবার খাও।"

স্বাবলম্বী ও দ্বীনের শিক্ষাদান: নবীজি তাঁর স্ত্রীদের কেবল ঘরের কাজের মধ্যে বন্দী রাখেননি, বরং তাদের দ্বীনি ইলম ও কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা পরবর্তীতে পুরো উম্মতের শিক্ষিকায় পরিণত হয়েছিলেন।

অধ্যায় ৯: বিদায় হজ্ব ও নবীজির ইন্তেকাল

৯.১ ঐতিহাসিক বিদায় হজ্ব ও মানবাধিকারের ঘোষণা (The Farewell Pilgrimage - 10 A.H.)

হিজরতের দশম বছর (১০ হিজরী) জিলকদ মাসে নবীজি (সা.) ঘোষণা করলেন যে তিনি উম্মতকে নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করবেন। এই খবর শুনে আরবের চারপাশ থেকে প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার (কারো মতে ১ লাখ ৪০ হাজার) সাহাবী মদীনায় সমবেত হন। এটিই ছিল নবীজির জীবনের প্রথম এবং শেষ হজ্জ, যা ইতিহাসে 'বিদায় হজ্ব' নামে পরিচিত।

আরাফাতের ময়দানের ভাষণ: ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার দুপুরের পর নবীজি (সা.) জাবালুর রাহমাহর পাদদেশে 'কাসওয়া' নামক উটের পিঠে চড়ে সমবেত বিশাল মানবসমুদ্রের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ভাষণ দেন।

বিদায় হজ্জ: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, খুতবা ও তার কালজয়ী শিক্ষা

১. বিদায় হজ্জের প্রেক্ষাপট ও মক্কা যাত্রা

নবুওয়াতের ২৩তম বছরে এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে তাঁর প্রেরণের মহান উদ্দেশ্য ও মিশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যে শিরক ও জাহেলিয়াতকে পৃথিবী থেকে চিরতরে দূর করার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রাথমিক কাজ শেষ। কিয়ামত পর্যন্ত এই তাওহীদের মিশনকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলিম উম্মাহর কাছে মৌলিক দিকনির্দেশনা পৌঁছে গেছে এবং শীঘ্রই তিনি তাঁর মহান রব্বের সান্নিধ্যে চলে যাবেন।

এই উদ্দেশ্যে ১০ম হিজরীতে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঐতিহাসিকভাবে হজ্জ পালনের ঘোষণা দিলেন। এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে আরব ভূখণ্ডের কোণায় কোণায় থাকা মুসলমানরা দলে দলে মক্কায় সমবেত হতে লাগলেন।

মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা:

জিলকদ মাস শেষ হতে যখন মাত্র চার দিন বাকি, তখন এক শনিবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন। মদীনা থেকে যোহরের সালাত আদায় করে তিনি রওনা হলেন। আসরের আগেই তিনি মদীনার মীকাত 'যুল হুলাইফা' (বর্তমান নাম আবিয়ারে আলী) পৌঁছালেন। সেখানে আসরের দুই রাকাত (কসর) সালাত আদায় করলেন এবং সেই রাতটি সেখানেই কাটালেন।

পরদিন যোহরের সালাতের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল করলেন এবং যোহরের দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর মুসাল্লায় (নামাজের স্থানে) বসে উচ্চস্বরে হজ্জ ও ওমরার যৌথ নিয়তে তালবিয়াহ ("লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...") পাঠ করতে লাগলেন।

২. মক্কায় প্রবেশ ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা

মক্কার কাছাকাছি 'যী-তুওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রাবিরতি করলেন। সেখানে রাত্রিযাপন করে ফজরের সালাত আদায়ের পর তিনি পুনরায় গোসল করলেন এবং সকালবেলা মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিনটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা জিলহজ্জ, রবিবার।

তাওয়াফ ও সাঈ: মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম অত্যন্ত ভক্তিভরে কাবা শরীফ তাওয়াফ করলেন। এরপর মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে ২ রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং পুনরায় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। এরপর তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে 'সাঈ' (দৌড়ানো) সম্পন্ন করলেন। যেহেতু তিনি হজ্জ ও ওমরাহ উভয়ের ইহরাম একসাথে বেঁধেছিলেন (হজ্জে কেরান), তাই সাঈ করার পরও তিনি ইহরাম খোলেননি।

মিনায় অবস্থান: ৮ই জিলহজ্জ রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে তিনি জিলহজ্জের ৯ তারিখ সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন। মিনায় তিনি যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের— এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাসময়ে আদায় করলেন।

আরাফাতের ময়দানে যাত্রা: ৯ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর তিনি আরাফাতের ময়দানের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে 'নামিরা' নামক স্থানে তাঁর জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করা হলো। এরপর তিনি দুপুরের দিকে আরাফাতের ভেতরের 'ওয়াদী-এ-উরনাহ' (বা বাতনে ওয়াদী) উপত্যকায় চলে গেলেন।

৩. বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ

আরাফাতের সেই বিশাল ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তখন প্রায় ১,২৪,০০০ (মতান্তরে ১,৪৪,০০০) সাহাবীর এক অভূতপূর্ব জনসমুদ্র। এই বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে আবেগঘন, ঐতিহাসিক ও কালজয়ী ভাষণ প্রদান করলেন। সমবেত উম্মতকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন:

"হে লোকসকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ আমি জানি না, এই বছরের পর এই স্থানে তোমাদের সাথে আমার আর কখনো দেখা হবে কি না। মনে রেখো, তোমাদের রক্ত (জীবন) এবং তোমাদের ধন-সম্পদ কিয়ামত পর্যন্ত একে অপরের জন্য তেমনি পবিত্র ও হারাম, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, এই জিলহজ্জ মাস এবং তোমাদের এই শহর (মক্কা)।"

ভাষণের মূল ঘোষণাসমূহ:

১. জাহেলিয়াতের অবসান: রাসূল ﷺ ঘোষণা করলেন, "শুনে রাখো, জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগের সমস্ত কুপ্রথা আজ থেকে আমার পায়ের নিচে পিষ্ট ও বিলুপ্ত করা হলো। অন্ধকার যুগের সমস্ত রক্তের প্রতিশোধ (রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার প্রথা) রহিত করা হলো।" (তিনি নিজের পরিবার থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে সর্বপ্রথম বনু সাদ গোত্রে

লালিত-পালিত তাঁর চাচাতো ভাই রাবীয়া ইবনে হারিসের শিশু সন্তানের হত্যার প্রতিশোধ মাফ করে দিলেন, যাকে হুজাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল)।

২. সুদ প্রথার বিলুপ্তি: অন্ধকার যুগের সব ধরনের সুদের ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। রাসূল ﷺ এখানেও নিজের পরিবার থেকে শুরু করে সর্বপ্রথম তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সমস্ত বকেয়া সুদ মওকুফ করে দিলেন।

৩. নারীদের অধিকার: নারীদের প্রতি সদয় আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন, "নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেছ।"

৪. উম্মতের সাক্ষ্য গ্রহণ: ভাষণ শেষে রাসূল ﷺ সাহাবীদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি আল্লাহর দ্বীন তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? আমার দায়িত্ব কি পালন করেছি?" সমবেত লক্ষ জনতা সমস্বরে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন।" তখন রাসূল ﷺ আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।" এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন, আজ যারা উপস্থিত আছে তারা যেন এই বাণী অনুপস্থিত মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়।

হজ্জের সমাপ্তি:

এরপর ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় অবস্থান করেন এবং 'আইয়ামে তাশরীক'-এর দিনগুলোতেও মিনায় খুতবা প্রদান করেন (যা কোরবানির দিনের খুতবার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল)। এটি সূরা নাসর নাজিল হওয়ার পরের ঘটনা। ১৩ই জিলহজ্জ দুপুরের পর তিনি মিনা থেকে রওনা হয়ে বনু কেনানাহ গোত্রের এলাকা 'ওয়াদীয়ে আবতাহ'-এ যাত্রাবিরতি করেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেন। এরপর গভীর রাতে মক্কায় এসে 'বিদায়ী তাওয়াফ' সম্পন্ন করেন। হজ্জের সমস্ত কাজ শেষ হলে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

৪. বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে আমাদের শিক্ষণীয়:

১. নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা: যেকোনো আদর্শ বা নিয়ম সমাজ ও পরিবারে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবার আগে নিজের জীবন ও পরিবার থেকে তা শুরু করতে হয়। নিজের মধ্যে আমল না থাকলে মুখে যতই বড় আদর্শের কথা বলা হোক, মানুষের অন্তরে তা প্রভাব ফেলে না। নবীজী ﷺ সুদ ও রক্তের প্রতিশোধ মওকুফের ঘোষণা নিজের পরিবার থেকেই শুরু করেছিলেন।

২. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের মঞ্চ থেকে মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ একে অপরের জন্য হারাম ও নিরাপদ করা হয়েছে।

৩. ন্যায়পরায়ণ আমীরের আনুগত্য: রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে বলেছেন, যদি কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসও (শারীরিক ত্রুটিযুক্ত হলেও) মুসলমানদের নেতা মনোনীত হন এবং তিনি যদি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করেন, তবে তাঁর আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।

৪. শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি 'তাকওয়া': ইসলামে বংশ, বর্ণ, ভাষা বা গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের কোনো স্থান নেই। রাসূল ﷺ অহংকারের এই দেয়াল ভেঙে দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তার 'তাকওয়া' বা খোদাভীতির ভিত্তিতে।

৫. গুনাহ ও পাপ থেকে সতর্কতা: বর্তমান যুগে সচেতন মুসলমানরা সহজে কুফর বা শিরকে লিপ্ত না হলেও, ছোট-বড় বিভিন্ন গুনাহে খুব সহজেই জড়িয়ে পড়েন। বিদায় হজ্জের ভাষণে শয়তানের সূক্ষ্ম ফাঁদ ও গুনাহের কাজ থেকে উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

৬. কুরআন ও সুন্নাহই মুক্তির একমাত্র সংবিধান: নবীজী ﷺ ঘোষণা করেছেন, যতদিন মানবজাতি কুরআন ও সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তারা পথভ্রষ্ট হবে না। এই সংবিধান কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত পুরো মানবজাতির হেদায়েত ও মুক্তির একমাত্র পাথেয়।

৭. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও নারীর সম্মান: দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের ওপর সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদায় হজ্জের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামে নারীর সর্বোচ্চ সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করে গেছেন।

দ্বীনের পূর্ণতার ঘোষণা: ভাষণ শেষ করার পর নবীজি আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি?" লাখো মানুষ সমস্বরে বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই দিয়েছেন।" তখন নবীজি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।" ঠিক সেই মুহূর্তে আরাফাতের ময়দানে ওহী নাযিল হয়: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম..." (সূরা আল-মায়েদাহ: ০৩)

৯.২ সর্বশেষ সামরিক অভিযান ও উসামা (রা.)-এর নেতৃত্ব (The Expedition of Usama)

বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পর ১১ হিজরীর সফর মাসে নবীজি (সা.) রোমান সাম্রাজ্যের (Byzantine) আগ্রাসন মোকাবেলা করার জন্য সিরিয়ার সীমান্তে একটি বিশাল লস্কর বা সামরিক অভিযান প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন।
নবীজি (সা.) এই অভিযানের প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন তরূণ সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে, যাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ থেকে ২০ বছর। উসামা ছিলেন নবীজির প্রিয় মুক্তিকৃত দাস যায়েদ ইবনে হারিসাহ (যিনি মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)-এর পুত্র। প্রবীণ বড় বড় মুহাজির ও আনসার সাহাবী (যেমন উমর রা.) থাকা সত্ত্বেও একজন তরুণকে সেনাপতি করায় মদীনায় কিছুটা গুঞ্জন তৈরি হয়।

নবীজি (সা.) তীব্র অসুস্থতার মধ্যেও মিম্বারে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে বললেন, "তোমরা যদি উসামার নেতৃত্বের সমালোচনা করো, তবে এর আগে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! উসামা সেনাপতি হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য এবং সে আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র।" নবীজির এই নির্দেশের পর সমস্ত সাহাবী উসামার নেতৃত্বে মদীনার বাইরে 'জুরুফ' নামক স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেন। তবে নবীজির অসুস্থতা হঠাৎ আশঙ্কাজনক রূপ নেওয়ায় এই অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

৯.৩ জীবনের শেষ দিনগুলো ও শেষ ওসিয়তনামা (The Last Days of Prophet)

১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে নবীজি (সা.)-এর অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করে। তাঁর মাথা ব্যথার তীব্রতা এবং গায়ের জ্বর এত বেশি ছিল যে সাতটি ভিন্ন কূপের ঠাণ্ডা পানি তাঁর মাথায় ঢালা হতো।
আয়েশা (রা.)-এর ঘরে স্থানান্তর: নবীজি স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে তাঁর শেষ দিনগুলো কাটানোর জন্য হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় (ঘরে) স্থানান্তরিত হন।

আবু বকর (রা.)-এর ইমামতি: নবীজি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি আয়েশা (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, "আবু বকরকে বলো মানুষের ইমামতি করতে।" আয়েশা (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা অত্যন্ত নরম দিলের মানুষ, তিনি মিম্বারে দাঁড়ালে কান্নার জন্য আপনার স্থানটি দেখতে পাবেন না এবং কেরাত পড়তে পারবেন না।" কিন্তু নবীজি তিনবার দৃঢ়তার সাথে বললেন, "আবু বকরকেই সালাত পড়াতে বলো।" নবীজির জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদে নববীতে ১৭ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করেন, যা ছিল মূলত নবীজির পর আবু বকরই যে ইসলামের প্রথম খলীফা হবেন— তার একটি পরোক্ষ ও অকাট্য দলিল।

জীবনের শেষ ওসিয়ত: মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে নবীজি মাথায় পট্টি বেঁধে সাহাবাদের কাঁধে ভর দিয়ে শেষবারের মতো মসজিদে আসেন। তিনি মিম্বারে বসে বললেন, "আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার নেয়ামত অথবা আল্লাহর সান্নিধ্য— এই দুটির যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। সেই বান্দা আল্লাহর

সান্নিধ্যকে বেছে নিয়েছে।" এই কথা শুনে আবু বকর (রা.) ডুকরে কেঁদে উঠলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 'বান্দা' বলতে নবীজি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। নবীজি শেষ ওসিয়ত হিসেবে বারবার বলছিলেন:

"আস-সালাহ, আস-সালাহ, ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম!" (তোমরা সালাতের ব্যাপারে সাবধান থাকো, সালাতের ব্যাপারে সাবধান থাকো! এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি দয়া করো)।

৯.৪ রফীকুল আলা: প্রিয়তম প্রভুর সান্নিধ্যে প্রস্থান (The Demise of Prophet)

১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার মদীনার আকাশ কালো করে এক বিষাদময় সকাল ঘনিয়ে এল। সকালের দিকে নবীজির ঘরের পর্দা একটু সরালে তিনি দেখতে পান সাহাবীগণ আবু বকরের পেছনে সালাত আদায় করছেন। তা দেখে নবীজি অত্যন্ত তৃপ্তির এক মনমুগ্ধকর হাসি হাসেন, সাহাবীগণ ভেবেছিলেন নবীজি বুঝি সুস্থ হয়ে গেছেন। কিন্তু ওটাই ছিল তাঁর শেষ বিদায়ের হাসি।

হযরত আয়েশার কোলে শেষ নিঃশ্বাস: দুপুরের দিকে নবীজি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর বুকে পিঠ হেলান দিয়ে অর্ধ-চেতন অবস্থায় ছিলেন। আয়েশার ভাই আব্দুর রহমান মেসওয়াক হাতে ঘরে প্রবেশ করলে নবীজি মেসওয়াকের দিকে তাকান। আয়েশা (রা.) বুঝতে পেরে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মেসওয়াকটি নরম করে নবীজির হাতে দেন এবং নবীজি পরম তৃপ্তির সাথে শেষ মেসওয়াকটি করেন। এর পরপরই নবীজির হাত থেকে মেসওয়াকটি পড়ে যায় এবং তাঁর চোখ দুটি আকাশের দিকে স্থির হয়ে যায়। তিনি ফিসফিস করে তিনবার উচ্চারণ করলেন:

"বালির রফীকিল আলা... বালির রফীকিল আলা..." (বরং আমি ঊর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সান্নিধ্য চাই)।

এই পবিত্র বাণী উচ্চারণের সাথে সাথেই বিশ্বজগতের রহমত, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৬৩ বছর বয়সে মদীনার পবিত্র মাটিতে মা আয়েশার কোলে শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রফীকুল আলার সাথে মিলিত হন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

৯.৫ উমর (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া ও আবু বকর (রা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ (Grief and Consolation)

নবীজি (সা.)-এর ইন্তেকালের খবর মদীনায় ছড়িয়ে পড়লে পুরো মদীনা শহর স্তব্ধ হয়ে যায়। সাহাবীগণ শোকে ও আতঙ্কে উন্মাদের মতো হয়ে পড়েন।

উমর (রা.)-এর তরবারি কোষমুক্ত করা: বীর উমর ইবনুল খাত্তাব এই চরম সত্যটি সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি তরবারি বের করে মক্কার চত্বরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "মুনাফিকরা রটাচ্ছে যে আল্লাহর রাসূল মারা গেছেন! আল্লাহর কসম, তিনি মারা যাননি। মূসা (আ.) যেমন আল্লাহর সাথে কথা বলতে ৪০ দিনের জন্য গায়েব হয়েছিলেন, আমাদের নবীও ঠিক তেমনই আল্লাহর কাছে গেছেন। যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মাদ মারা গেছেন, আমি এই তরবারি দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলবো!" শোকে মদীনার মানুষ তখন আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

আবু বকর (রা.)-এর ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা ও ভাষণ:

এই চরম সংকটের মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হুজরা শরিফে প্রবেশ করে নবীজির পবিত্র কপালে চুমু খেলেন এবং কেঁদে বললেন, "আপনার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই পবিত্র। আল্লাহ আপনার ওপর দুটি মৃত্যু একত্র করবেন না।" এরপর তিনি বাইরে এসে উমর (রা.)-কে শান্ত হতে বললেন এবং সমবেত মদীনা উম্মাহর সামনে ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে অটল, দূরদর্শী ও যুগান্তকারী ভাষণটি দিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১৪৪ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন:
"হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো যে মুহাম্মাদ (সা.) নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো যে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।"

আল্লাহ তাআলা বলেন: "মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নন! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা তোমাদের হিল বা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে?"
"হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো যে মুহাম্মাদ (সা.) নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো যে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।"

আল্লাহ তাআলা বলেন: "মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নন! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা তোমাদের হিল বা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে?"

আবু বকরের এই শান্ত ও অকাট্য ভাষণ শোনার পর উমর (রা.)-এর হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল এবং তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। মদীনার সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন যে সত্যি তাঁদের মাথার ওপর থেকে পরম ছায়া চিরতরে সরে গেছে।

৯.৬ কাফন ও দাফন মোবারক (The Burial)

নবীজি (সা.)-এর পবিত্র গোসল মোবারক সম্পন্ন করেন হযরত আলী, আব্বাস (রা.) এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)। রাসুলের পরিহিত জামা না খুলেই যমযমের পানি দিয়ে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গোসল করানো হয় এবং ৩টি সাদা সুতি চাদর দিয়ে কাফন পরানো হয়।

দাফনের স্থান বিতর্ক ও সমাধান: নবীজির দাফনের স্থান নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, "আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি— নবীগণ যেখানেই ইন্তেকাল করেন, ঠিক সেখানেই তাঁদের দাফন করতে হয়।" এই নির্দেশ অনুযায়ী, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরার ভেতরে যে বিছানায় নবীজি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক সেখানেই হযরত আবু তালহা (রা.) একটি পবিত্র কবর খনন করেন।

জানাজার সালাত: নবীজি (সা.)-এর জানাজার সালাতে কোনো নির্দিষ্ট ইমাম ছিলেন না। সাহাবীগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হুজরার ভেতরে প্রবেশ করে একে একে জানাজা (দরূদ ও দুআ) পড়ে বের হয়ে আসতেন। প্রথমে পুরুষ সাহাবীগণ, এরপর নারীগণ এবং সবশেষে শিশুরা জানাজা সম্পন্ন করেন। অতঃপর বুধবার রাতে (কারো মতে মঙ্গলবার রাতে) বিশ্বনবীকে চিরতরে দাফন করা হয়, যা আজ বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ের স্পন্দন 'রওজা মোবারক' হিসেবে মদীনার বুকে মস্তক উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অধ্যায় ১০: সীরাত থেকে শিক্ষা

১০.১ সীরাতে নববীর আলোকে আদর্শ নেতৃত্বের গুণাবলী (Qualities of Ideal Leadership in Seerah)

হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল একজন ধর্মীয় প্রচারক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি এবং সমাজ সংস্কারক। 'Ar-Raheeq Al-Makhtum'-er বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করলে তাঁর নেতৃত্বের অনন্য ৮টি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, যা সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যেকোনো নেতার জন্য চিরন্তন গাইডলাইন:

১. চরম সততা ও আমানতদারী (Absolute Integrity): একজন সফল নেতার সবচেয়ে বড় গুণ হলো তাঁর সততা, যার মাধ্যমে তিনি অনুসারীদের আস্থা অর্জন করেন। নবীজি (সা.) নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বেই মক্কাবাসীদের কাছে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। হিজরতের রাতে যখন তাঁর জীবন চরম ঝুঁকিতে, তখনও তিনি মক্কার কাফেরদের গচ্ছিত আমানতগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা.)-কে নিজের বিছানায় রেখে এসেছিলেন। শত্রুরা তাঁর ধর্মকে অস্বীকার করলেও তাঁর সততাকে কখনো অস্বীকার করতে পারেনি।

২. শূরা বা পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত (Consultative Leadership): নবীজি (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং ওহীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ (শূরা) করতেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন: "এবং কাজের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" (সূরা আল-ইমরান: ১৫৯)।

উদাহরণ: ওহুদ যুদ্ধে মদীনার ভেতরে থেকে নাকি বাইরে গিয়ে প্রতিরোধ করা হবে—তা তিনি সাহাবাদের সংখ্যাগুরু মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আবার খন্দকের যুদ্ধে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরিখা খননের অভিনব পরামর্শকে সানন্দে গ্রহণ করে মদীনাকে রক্ষা করেছিলেন।

৩. অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা (Endless Patience): প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মেজাজ না হারিয়ে শান্ত থাকা একজন মহান নেতার লক্ষণ। তায়েফের ময়দানে যখন তাঁকে রক্তাক্ত করা হলো, তখন তিনি ক্রুদ্ধ না হয়ে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাদের হেদায়েতের জন্য দুআ করেছেন। মক্কী জীবনের ১৩ বছরের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও শিয়াবে আবু তালিবে ৩ বছরের অবরুদ্ধ জীবন তিনি অসীম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন, যা তাঁর অনুসারীদেরকে যেকোনো সংকটে অটল থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

৪. সাম্য ও অহংকারহীনতা (Egalitarianism and Humility): নবীজি (সা.) কখনো নিজেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা বা ভিআইপি মনে করতেন না। তিনি খন্দকের যুদ্ধে সাহাবাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাটি ও পাথর কেটে পরিখা খনন করেছেন। মসজিদে নববী নির্মাণের সময় সাধারণ শ্রমিকের মতো ইট বহন করেছেন। কুবা থেকে মদীনায় আসার পথে উটের পিঠে চড়ার ক্ষেত্রে নিজের খাদেমের সাথে পালাবদল করেছেন। তাঁর এই নিরহংকার নেতৃত্ব অনুসারীদের হৃদয়ে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা তৈরি করেছিল।

৫. ক্ষমা ও উদারতা (Forgiveness and Magnanimity): ক্ষমতা থাকার পরও শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়া প্রকৃত বীরত্ব। মক্কা বিজয়ের দিন যখন তাঁর সমস্ত রক্তপিপাসু শত্রু (আবু সুফিয়ান, ইকরামা, হিন্দ) তাঁর সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তিনি ইউসুফ (আ.)-এর বাণী উচ্চারণ করে সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই অভাবনীয় উদারতা দেখে আরবের হাজার হাজার মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

৬. দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা (Visionary and Tactical Acumen): হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন সাহাবীগণ চুক্তির অপমানজনক শর্ত দেখে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন, তখন নবীজি (সা.) দূরদর্শিতার সাথে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। বাহ্যিক পরাজয় মনে হলেও এই চুক্তির ফলেই আরবে শান্তির পরিবেশ তৈরি হয় এবং ইসলামের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা কুরআনে 'স্পষ্ট বিজয়' হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

৭. আইনের শাসন ও সুবিচার (Rule of Law): নেতার কাছে নিজের আত্মীয় এবং সাধারণ মানুষের আইনী অধিকার সমান হতে হবে। বনু মাখযূম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত নারী যখন চুরির অপরাধে ধরা পড়ল, তখন সাহাবীগণ তাঁর বংশের মর্যাদার কথা চিন্তা করে সুপারিশ করতে চাইলেন। নবীজি (সা.) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঐতিহাসিক ঘোষণা দিলেন

:

"আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাতও কেটে দিতাম।" (সহীহ বুখারী)

৮. অনুসারীদের প্রতি গভীর দয়া ও সহানুভূতি (Empathy for Followers): একজন আদর্শ নেতা তাঁর অনুসারীদের সুখ-দুঃখে সবসময় পাশে থাকেন। যুদ্ধের ময়দানে কোনো সাহাবী শহীদ হলে নবীজি তাঁর পরিবারের দায়িত্ব নিতেন। ক্ষুধার্ত সাহাবাদের দেখে নিজের ঘরের শেষ খাবারটুকু বিলিয়ে দিতেন। যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তেও তিনি সাহাবাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি সবার আগে দেখতেন।

১০.২ সীরাতে নববীর আলোকে একজন দা'ঈর কাম্য বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of a True Da'ee)

সীরাত ইবনে হিশামের পাতায় পাতায় একজন দা'ঈ বা দ্বীনের প্রচারকের জন্য সর্বোত্তম কর্মপন্থা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। নবীজি (সা.) যেভাবে দাওয়াত দিয়ে আরবের বর্বর সমাজকে সোনার মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন, সেই দাওয়াতী কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. হিকমত বা প্রজ্ঞা (Wisdom in Dawah): আল্লাহ তাআলা বলেন: "আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা (হিকমত) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা আন-নাহল: ১২৫)। নবীজি (সা.) মানুষের মানসিকতা, সামাজিক অবস্থান এবং বুদ্ধি বিবেচনা করে দাওয়াত দিতেন। গ্রামীণ বেদুইনদের সাথে সহজ সরল ভাষায় এবং মক্কার কুরাইশ নেতাদের সাথে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ উপায়ে কথা বলতেন।

২. ধাপ অনুযায়ী দাওয়াত (Gradual Approach): নবীজি (সা.) শুরুতেই সব নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দেননি। প্রথম তিন বছর মক্কার পরিবেশ বিবেচনা করে অত্যন্ত গোপনে বিশ্বস্তদের মাঝে দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর সাফা পাহাড়ে প্রকাশ্যে তাওহীদের ঘোষণা দিয়েছেন। মাদানী জীবনে গিয়ে তিনি রাষ্ট্র ও সমাজিক বিধি-বিধানের দাওয়াত দিয়েছেন। এই ক্রমান্বয় পদ্ধতি একজন দা'ঈর জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

৩. আচরণ ও চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াত (Dawah through Character): মুখের কথার চেয়ে মানুষের আচরণ বেশি প্রভাবশালী হয়। নবীজি (সা.)-এর পবিত্র চরিত্রই ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় দাওয়াত। ইহুদি বুড়ি নবীজির রাস্তায় প্রতিদিন কাঁটা বিছিয়ে রাখত, কিন্তু সে যখন অসুস্থ হলো, নবীজি তার বাড়ি গিয়ে তার সেবা করলেন। এই অনুপম চরিত্র দেখে বুড়ি লজ্জিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। একজন দা'ঈর কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা বাধ্যতামূলক।

৪. কঠোরতা বর্জন ও নম্রতা (Gentleness and Avoiding Severity): দাওয়াতের ভাষা হতে হবে অত্যন্ত নরম ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা নবীজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "আল্লাহর রহমতের কারণেই আপনি তাদের প্রতি নম্র হয়েছেন; যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে দূরে সরে যেত।" (সূরা আল-ইমরান: ১৫৯)। নবীজি কখনো মানুষকে ঘৃণা বা গালি দিয়ে দাওয়াত দেননি, বরং ভালোবেসে অন্ধকারের মানুষদের আলোর পথে টেনে এনেছেন।

৫. নিষ্ঠা ও নির্লোভ মানসিকতা (Sincerity and Selflessness): একজন প্রকৃত দা'ঈ দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ, ক্ষমতা বা টাকা-পয়সার লোভে দাওয়াত দেন না। কুরাইশ নেতারা যখন নবীজিকে দাওয়াত বন্ধ করার বিনিময়ে আরবের রাজত্ব, অফুরন্ত ধন-সম্পদ এবং আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন নবীজি চাচার মাধ্যমে ঐতিহাসিক উত্তর দিয়েছিলেন:

"চাচা! আল্লাহর কসম, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি এই তাওহীদের দাওয়াত ছেড়ে দেব না; যতক্ষণ না আল্লাহ একে বিজয়ী করেন অথবা আমি এর পেছনে ধ্বংস হয়ে যাই।"

উপসংহার (Conclusion)

সীরাতে নববী কেবল ইতিহাসের কোনো সাধারণ অধ্যায় বা প্রাচীন গল্পগাথা নয়; এটি হলো মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র বাস্তব রূপরেখা। মক্কার জাহেলী সমাজের চরম অন্ধকার থেকে শুরু করে মদীনার বুকে পৃথিবীর প্রথম আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত— রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি দিন ও মুহূর্ত অলৌকিক সত্যতা এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল।

বক্ষ্যমাণ গবেষণায় আমরা সীরাত শাস্ত্রের আদি উৎস **"সীরাত ইবনে হিশাম"** এবং আধুনিক প্রামাণ্য গ্রন্থ **"আর-রাহীকুল মাখতূম"**-এর আলোকে প্রাক-ইসলামী আরবের অবক্ষয়, নবীজি (সা.)-এর অলৌকিক শৈশব, নবুওয়াত পূর্ব নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, ওহী নাযিলের কঠিন অধ্যায়, মক্কী জীবনের অবর্ণনীয় নির্যাতন, মদীনার হিজরত এবং ঐতিহাসিক যুদ্ধসমূহের বুনিয়াদী শিক্ষা আলোচনা করেছি। একই সাথে উম্মুল মুমিনীন (রা.)-গণের প্রতি নবীজির পারিবারিক সুবিচার এবং বিদায় হজ্বের চিরন্তন মানবাধিকারের ভাষণ বর্তমান পৃথিবীর অশান্তি ও নৈতিক সংকট দূর করার একমাত্র মহৌষধ।

একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য সীরাত অধ্যয়ন করা ফ্যাশন নয়, ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নবীজি (সা.)-এর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহর এই মহান আদর্শকে ব্যক্তি, পরিবার এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই কেবল মুসলিম উম্মাহ তাঁর হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরে পেতে পারে এবং একটি শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে পারে।

রেফারেন্স :

১. প্রধান ভিত্তি বা মূল গ্রন্থসমূহ (Core References):

সীরাত ইবনে হিশাম: এটি সীরাত বা নবীজির জীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন, মৌলিক ও বিশুদ্ধতম উৎস। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর 'কিতাবুল মাগাযী ওয়া সিয়ার'-এর ওপর ভিত্তি করে আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম (রহ.) এই গ্রন্থটি পরিমার্জন ও সংক্ষেপন করেন। জাহেলী আরবের ধর্মীয় অবস্থা, মূর্তিপূজার সূচনা, মক্কার গোত্রীয় দ্বন্দ্ব এবং মদীনার ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মতো ঐতিহাসিক বিবরণগুলো এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আর-রাহীকুল মাখতূম: এটি আধুনিক যুগের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থ। আরবের ভৌগোলিক অবস্থান, এর কৌশলগত ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব, আইয়ামে জাহেলিয়াতের কুসংস্কার এবং কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো সামাজিক অবক্ষয়ের বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।

২. ইসলামিক মৌলিক উৎসসমূহ (Primary Islamic Sources):
আল-কুরআন: সীরাহ বা জীবনীর প্রথম ও প্রধান উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার আয়াত সরাসরি রেফারেন্স বা শানে নুযূলের (নাজিলের প্রেক্ষাপট) প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

সূরা আল-আহযাব (আয়াত: ২১ ও ৪০): রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ ও শেষ নবী হওয়ার প্রমাণে।

সূরা আল-ইমরান (আয়াত: ১৫৯): নবীজি (সা.)-এর পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত (শূরা) ও তাঁর নম্র আচরণের বিবরণে।

সূরা লাহাব, সূরা তাওবাহ (আয়াত: ১১৭), সূরা আল-আম্বিয়া (আয়াত: ১০৭), সূরা ফাতহ (আয়াত: ১ ও ১৮) এবং সূরা মুমতাহিনা (আয়াত:

হাদীস গ্রন্থসমূহ: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন, বাণী ও অলৌকিক ঘটনার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে হাদীস থেকে রেফারেন্স নেওয়া হয়েছে। যেমন:

সহীহ বুখারী: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও ঈমানের পূর্ণতা বিষয়ক হাদীসের বর্ণনায়।

সহীহ মুসলিম: নবীজি (সা.)-এর বংশমর্যাদা ও হাশেমী গোত্রের গুরুত্ব, তাঁর ৫টি পবিত্র নাম এবং শৈশবে 'বক্ষ বিদারণ' (শকুস সদর)-এর অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় এই গ্রন্থের হাদীস ব্যবহার করা হয়েছে।

শামায়েল ও ।লাইল গ্রন্থসমূহ:

শামায়েলে তিরমিযী (ইমাম তিরমিযী): রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও শারীরিক গঠনের বর্ণনার উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দালাইলুন নবুওয়াত (ইমাম বায়হাকী): রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীর বিবরণের অন্যতম উৎস।

৩. অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সাহাবীগণের বর্ণনা (Historical Accounts & Scholar Opinions):

সাহাবীদের ঐতিহাসিক বর্ণনা: হযরত আনাস (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর মতো সাহাবীগণের প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক বর্ণনা ও সূত্রকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

উম্মে মাবাদ-এর বর্ণনা: হিজরতের সফরে উম্মে মাবাদ নামক এক বৃদ্ধার তাঁবুতে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনা এবং তাঁর দেওয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবয়ব ও শারীরিক সৌন্দর্যের ঐতিহাসিক বিবরণটি যুক্ত করা হয়েছে।

ইসলামী স্কলারদের মতামত: সীরাত ও হাদিস শাস্ত্রের তথ্য গ্রহণ ও যাচাইয়ের নিয়মতান্ত্রিক পার্থক্যের ক্ষেত্রে হাদিস শাস্ত্রের ইমাম, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর বক্তব্য এবং চারবার বক্ষ বিদারণের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (রহ.)-এর মতামতের রেফারেন্স উল্লেখ রয়েছে।

৪.IOM seerah 1st and 2nd part.